পাইরেটস্
ডেন-এর

সম্পাদক
অরিত্র ভট্টাচার্য্য

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সৌম্য সরকার
পবিত্র পাল
শুভদীপ দাস

প্রচ্ছদ
অরিত্র ভট্টাচার্য্য
পবিত্র পাল

চিত্র সৌজন্য
বিকাশ আগরওয়াল সঞ্জীব পাত্র দীপ সাউ
পবিত্র পাল ধৃতিমান মুখার্জী মৈনাক দে সপ্তর্ষি মুখার্জী
ইন্দ্রনীল মৈত্র অরবিন্দ পাল এবং ইন্টারনেট

প্রকাশক
অর্জন বসু রায়

মুদ্রণ
বর্ণনা প্রকাশনী
৬/৭, বিজয়গড় কলকাতা-৭০০০৩২
দূরভাষ: ৯৮৭৪৩৫৭৪১৪

সূচীপত্র

১. অ্যাকোয়ারিয়ামের ইতিহাস - অরিত্র ভট্টাচার্য্য।

২. প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের সহজপাঠ - সৌম্য সরকার।

৩. সাইকেলঃ বাই নয়, নাইট্রোজেন! সঞ্জীব পাত্র।

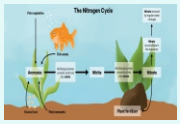

৪. সোনালী মহাশোল - সপ্তর্ষি মুখার্জী।

৫. কালো মাছের আলো - অভীক ঘোষ।

৬. জলের মাছে রূপোর টিপ - জ্যোতির্ময় রায়।

৭. মালাউই হ্রদের ডুবুরী - শুভদ্বীপ দাস।

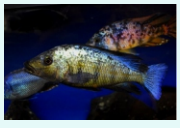

৮. শ্রিম্প পাঁচালী - মৈনাক দে।

৯. কাকজলার একাল সেকাল - ইন্দ্রনীল মৈত্র।

১০. ভিক্টোরিয়া ভালো নেই - পবিত্র পাল।

আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নং

9903569935
9333150179
9679747900

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা পয়লা বৈশাখ, ১৪২৮

সম্পাদকের কথা

কথায় বলে 'মাছে ভাতে বাঙালী'। নদীমাতৃক এই বঙ্গদেশে সেই আদিকাল থেকে আমাদের জীবনযাত্রার, খাদ্যাভ্যাসের, সাহিত্যের, ঐতিহ্যের, শুভাশুভের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে মাছ। বিশেষ করে আমাদের পেটের সাথে মাছের সম্পর্কটা বেশ পুরোনো। কিন্তু অবসরযাপনের কাঁচের বাক্সের সাথে মাছের সম্পর্কটা আমাদের কাছে অতটা কুলীন তো নয়ই, বরং বলা চলে সে সবেই কিছুটা পথ চলা শুরু করেছে। বয়সে সে সদ্য গালে নরম দাড়ি ওঠা কিশোরের থেকে বড়ো কিছু নয়। আর কৈশোরের যা স্বভাব! কৌতুহলের বশে জানতে চায়,দেখতে চায়,বুঝতে চায় সব কিছু; চায় চেনা ছক ভেঙ্গে নতুন কিছু গড়তে। আর বাঙালীর এই কিশোর শখের জানা বোঝার ঝোঁক পূরণ করার ইচ্ছা নিয়েই গড়ে উঠেছে ফেসবুকের এক গ্রুপ "Pirates' Den"। কোনোরকম বাণিজ্যিক সংস্রব ছাড়া প্রথমে গুটি গুটি পায়ে এগোনো এই গ্রুপ বর্তমানে মাছ সংক্রান্ত অন্যতম প্রধান জ্ঞান আদান প্রদানের মাধ্যম হয়ে উঠতে পেরেছে। একথার সাক্ষী আমাদের সাথে পথ চলা প্রায় সাড়ে তিন হাজার সঙ্গী যারা মাছকে ভালোবেসে, মাছের সম্পর্কে জানতে চেয়ে আমাদের হাত ধরেছেন, আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। আর জলদস্যুরা যেমন মূল্যবান রত্নরাজি আহরণ করে জমা করে তাদের গোপন গুহায়, তেমন এই গ্রুপও তিলতিল করে গ্রুপের সদস্যদের সাহায্যে জড়ো করছে দেশ বিদেশের মাছ সম্পর্কে, মাছ রাখার বিভিন্ন পরিবেশ সম্পর্কে, মাছের ইতিহাস সম্পর্কে, মাছের ঐতিহ্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও জ্ঞান। ধীরে ধীরে এই গ্রুপ হয়ে উঠছে মাছ সম্পর্কিত এক তথ্যভান্ডার যা রোজ রোজই ফুলে ফেঁপে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা লক্ষ্য করি যে বর্তমান বই এর বাজারে বাংলা ভাষায় লেখা মাছ এবং মাছ পোষার বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত কোন নির্ভরযোগ্য বই নেই যা একজন নতুন হবিস্টকে মাছ পোষার ব্যাপারে দিশা দেখাবে, উৎসাহ দেবে। এখান থেকেই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে তাহলে কি আমরা পারি না আমাদের এই রত্নভান্ডারের কিছুটা অংশকে দু মলাটের মধ্যে নিয়ে আসতে? কিন্তু বিধি বাম। স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার পথে কাঁটা হয়ে দেখা দিল এক অতিমারী যা গোটা বিশ্বকে এক লহমায় করে দিল গৃহবন্দী। শুরু হল আতঙ্কের প্রহরযাপন। কিন্তু তার মধ্যেও আমাদের মনে স্বস্তির, ভালোবাসার জায়গা দখল করে থাকলো ওই ছোট বড়ো জলজ প্রাণীরা। বর্তমানে যদিও আমরা কিছুটা চেষ্টা করছি স্বাভাবিক জীবনে ফেরার তাও এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে আমাদের চারপাশের জগৎ অনেক পালটে গেছে, অনেক "ভার্চুয়াল" হয়ে গেছে। তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও ভার্চুয়ালিই নিয়ে আসার পরিকল্পনা করি আমাদের সবার স্বপ্নের প্রজেক্ট, বাঙলা ভাষার এবং বাঙলা ভাষায় লেখা সর্বপ্রথম মাছের ই-ম্যাগাজিনের প্রথম পর্ব 'মেছোবই ১'। আমাদের গ্রুপে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হওয়া কিছু বাছাই করা লেখার সাথে সাথে থাকছে কিছু সম্পূর্ণ নতুন লেখা; সব মিলিয়ে দশটি ভিন্ন স্বাদের মাছ সম্পর্কিত লেখার একটি সচিত্র সংকলন। আশা করছি নতুন বছরে নতুন সুস্থ জীবনের বার্তা বয়ে নিয়ে আমাদের ই-ম্যাগাজিনটি আপনাদের সবার জীবনে এনে দিতে পারবে কিছুটা খোলা হাওয়ার আস্বাদ। আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখা কিছু চেনা এবং অচেনা মাছকে ও প্রকৃতিকে নতুন চোখে দেখতে ও ভালোবাসতে সাহায্য করবে আমাদের এই ম্যাগাজিনটি। যদি এই দমবন্ধের পরিবেশে এক ঝলক তাজা বাতাস আনতে পারে এই সংকলন, যদি একজনকেও মাছ ও প্রকৃতিকে আর একটু বেশী ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে এই সংকলন তবেই বুঝবো আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক। পরিশেষে বলি, আমাদের প্রথম প্রচেষ্টার যা কিছু ভুল-ত্রুটি তার দায় সম্পূর্ণভাবে আমাদেরই। ফলে নিশ্চিন্তে সদ্যোজাত এই ই-ম্যাগাজিনটি সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত জানাবেন এবং সুপরামর্শ দেবেন যাতে এর পরবর্তী পর্বগুলিতে আমরা আরো ভালোভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারি। কবিগুরুর দেখানো সত্যরে সহজে লওয়ার পথ ধরেই না হয় শুরু হোক এই মেছো পথচলা।

গ্রুপ এডমিন এন্ড মডারেটরস,
পাইরেটস ডেন গ্রুপ।

অ্যাকোয়ারিয়ামের ইতিহাস

সালটা ১৮৫৩। ইংলিশ সামার শুরু হয়ে গেছে। চারদিকের আবহাওয়া বেশ রৌদ্রোকোজ্জ্বল, মনোরম। মে মাস। এমনই এক দিনে রিজেন্ট পার্কের বিখ্যাত লন্ডন চিড়িয়াখানার কর্তাদের মুখে স্বস্তির হাসি। যদিও অন্যদিনের তুলনায় লোকের ভিড় সামলাতে তাঁদের কসরৎ করতে হচ্ছে একটু বেশীই,তা সত্ত্বেও এত কান্ড করে যে জিনিসটার উদ্বোধন আজ করা হয়েছে তা দেখতে এত মানুষ আসছেন দেখে তাঁদের সব পরিশ্রম সার্থক বলেই মনে হচ্ছে! হ্যাঁ,আজই প্রথমবার সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে 'ফিস হাউস', সহজ কথায় বলতে গেলে ইতিহাসের প্রথম পাবলিক অ্যাকোয়ারিয়াম। হেনরি গুজ এর ব্যবস্থাপনায় অনেকটা আজকের দিনের গ্রীন হাউসের আদলে সেজে উঠেছে এক প্রকান্ড অ্যাকোয়াটিক ভিভারিয়াম যার মধ্যে রয়েছে প্রায় তিনশ মাছ! আর তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সম্মান জানাতেই যেন সেদিন লন্ডন জু তে ভিড়ের পরিমাণ ছিল অন্যদিনের থেকে একটু বেশীই। তাই অ্যাকোয়ারিয়ামের ইতিহাসে এই দিনটি অন্যতম বেঞ্চমার্ক বলা যেতে পারে।

সাল ১৯৩৬। ওয়ারশ এর স্যাক্সন গার্ডেনে একুয়ারিয়াম, টেরারিয়ামের প্রদর্শনী। ছবিসৌজন্য- গ্লাসবক্স হিস্টরি পেজ

এবার এই "ইতিহাস" কথাটা শুনলেই আমাদের অনেকের মনেই ছোটবেলায় পড়া মাস বছর ঘটনা সম্বলিত একটা মোটা বই এর ছবি ভেসে ওঠে যা আমাদের বেশীরভাগের কাছেই খুব সুখকর নয়। তাই আমিও বরং ওই সাল আর তথ্যের কচকচি যথাসম্ভব এড়িয়ে অ্যাকোয়ারিয়ামের বিশালাকায় ঘটনা ও সালবহুল ইতিহাসকে একটু ছোট আর গল্পাকারে সাজাতে চেষ্টা করি।

এখনো অবধি পাওয়া ঐতিহাসিক প্রমাণানুসারে যদি "প্রাগৈতিহাসিক ফিশকিপিং" এর কোনো প্রতিযোগীতা করা যায় তাহলে তাতে প্রথম হবে সুমেরীয়ান সভ্যতা। প্রায় ৪৫০০ বছর আগেই তারা মাছ রাখতে শুরু করেছিলেন। তারপরেই আসবে ইজিপ্সীয়ানরা। আর তৃতীয় স্থানাধিকারী হবে চাইনিজ এবং জাপানীজরা যারা প্রায় ৩০০০ বছর আগে থেকেই খাওয়ার জন্য কার্প জাতীয় মাছ সংরক্ষণ করে রাখতেন। তবে হ্যাঁ,যদি শৌখিন মাছপুষিয়ের কথা আসে তাহলে কিন্তু সেই সভ্যতার কথাই আসবে যারা ইতিহাসে তাদের স্থাপত্য এবং শৌখিনতার জন্যই বিখ্যাত- রোমান! তারা পুকুর তৈরী করে তাতে সমুদ্রের জল ঢুকিয়ে বর্তমান মেরিন ট্যাঙ্কের আদিম ভার্সান তৈরী করে তাতে ল্যামপ্রে জাতীয় মাছ রাখতো। আর শৌখিনতা? তাহলে টার্টুলিয়ান (খ্রী ১৫৫-২৪০) এর গল্প শুনুন। উনি লিখেছেন যে এসিয়ানিউস সেলের ৮০০০ সেসেরটি দিয়েছিলেন তাঁর পছন্দের একটি মুলেট ফিসের জন্য। আর মহান সিসেরো তাঁর বন্ধু কুইন্টাস হোর্টেনসিয়াস সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি নাকি তাঁর এক প্রিয় মাছ মরে যাওয়ায় খুব কান্নাকাটি করেছিলেন! যদিও সিসেরো তাঁর এই বন্ধুদের "ফিস ব্রিডার" বলে উল্লেখ করেছেন তবুও এরা বর্তমান অর্থে ব্রিডার কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বরং ব্রিডিং এর ক্ষেত্রে চীনের সাঙ রাজবংশের ভুমিকা যা মোটামুটি ৯৬০-১২৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত ছিল উল্লেখযোগ্য। সেই আমল থেকেই কার্পের ব্রিডিং হওয়া শুরু হয়।

১৮৬৭ সালে ফিসকে কোম্পানী নির্মিত নিউ ইয়র্কের অন্যতম পুরোনো একুয়ারিয়াম। ছবিসৌজন্য- গ্লাসবক্স হিস্টরি পেজ

এবার আমরা একটু স্টেপ জাম্প করে প্রাচীন ইতিহাস থেকে চলে আসি মোটামুটি আধুনিক যুগের শুরুর দিকে। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে কিন্তু ইউরোপের বাজারে গোল্ডফিশ এশিয়া থেকে এসে অর্নামেন্টাল ফিশ হিসাবে কিছুটা জায়গা করে নিতে শুরু করেছে। তৎকালীন ইংরাজী সাহিত্যের বিখ্যাত ডাইরি লেখক স্যামুয়েল পিপস এর ডাইরিতে আমরা জারে রাখা গোল্ডফিশের উল্লেখ পাই যাকে উনি exceedingly fine বলেছেন। কিন্তু তখনো ভালোভাবে মাছকে বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখার কোন ধারণা লোকজনের ছিল না। কারণ? খুব সহজ। তখনো গাছ, প্রাণীজগৎ আর অক্সিজেন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সম্পর্ক অজানা ছিল! এই জিনিসগুলোর সাথে বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের পরিচয় হতে কেটে গেল আরো প্রায় এক শতক,অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক! আস্তে আস্তে বটানির ক্লাশে জায়গা করে নিতে লাগলো গাছ ও প্রাণীজগতের সম্পর্ক। "অ্যাকোয়ারিয়াম" কথাটাও প্রথম ব্যবহার হল জলজ উদ্ভিদ বাড়িয়ে তোলার পাত্রকে চিহ্নিত করতে! ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি রবার্ট ওয়ারিংটন নামের এক ভদ্রলোক প্রথম ট্যাঙ্ক "সাইকেল" করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা করতে পারলেন। তাঁর ট্যাঙ্ক সাইকেলের ধারণা ছিল খুব পরিষ্কার। তলায় বালি দিয়ে গাছপালা বসিয়ে তাতে শামুক ও মাছ ছাড়া হোক! গাছ মাছকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন দেবে, শামুক তলার নোংরা খাবে,ডিম পাড়বে এবং মাছ সেই ডিম খাবে। এর ওপর ভিত্তি করে স্টীল দিয়ে আটকানো কাঁচের শীট দিয়ে তিনি তৈরী করলেন প্রথম অ্যাকোয়ারিয়াম! তবে তাঁর এই আইডিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লেগেছিল আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর, আর সেটা করার পিছনে মস্ত ভুমিকা ছিল ওই লন্ডনের চিড়িয়াখানার প্রথম পাবলিক অ্যাকোয়ারিয়ামের,যার গল্প আমি প্রথমেই করেছি। ইতিমধ্যে প্রকৃতিবিদ্যার পাঠও বেশ ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেই সিলেবাসের অন্যতম চ্যাপ্টার হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে মাছ, সরীসৃপ এবং উভচর প্রাণীদের নিয়ে আলোচনা। জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃতি নিয়ে এই ক্রমবর্ধমান জ্ঞান আর প্রথম পাবলিক অ্যাকোয়ারিয়ামের জনপ্রিয়তা দেখে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অত্যন্ত দ্রুত গড়ে উঠলো একাধিক পাবলিক অ্যাকোয়ারিয়াম। ১৮৫৬ সালে পি.টি.বারনাম নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়েতে প্রথম আমেরিকান পাবলিক অ্যাকোয়ারিয়াম করেন যার নাম দেন "বারনাম'স আমেরিকান মিউসিয়াম"। তার তিনবছর পর বোস্টনে তৈরী হয় 'অ্যাকোয়ারিয়াল গার্ডেন'। ইউরোপও পিছিয়ে ছিল না! প্যারিসে ১৮৬০ সালে গড়ে উঠল 'জার্দি ডি এক্লেমেটেশঁ'। হামবুর্গ আর বার্লিনেও ওই ষাটের দশকেই গড়ে উঠল আরো দুই একুয়ারিয়াম। শুধুমাত্র অ্যাকোয়ারিয়াম স্থাপনেই এই মাছের প্রতি ভালোবাসার জোয়ার থেমে ছিলো না। এইসময় অ্যাকোয়ারিয়াম নিয়ে লেখালেখিও শুরু হয়।

সাল ১৯১৩। জার্মানী।
ছবিসৌজন্য- গ্লাসবক্স হিস্টরি পেজ।

সাল ১৯৭৪। বৌলে গাপ্পি রাখার প্রচেষ্টা।
ছবিসৌজন্য- গ্লাসবক্স হিস্টরি পেজ।

লন্ডন জু এর প্রথম পাবলিক অ্যাকোয়ারিয়ামের স্রষ্টা গুজ প্রথম "অ্যাকোয়ারিয়াম" কথাটি ব্যবহার করে ১৮৫৪ সালে The Aquariums an unveilling of the wonders of the deep water নামক বই লেখেন। ১৮৫৬ সালে এমিল রবমাবের নামে একজন একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন, Sea in a glass introducing fish keeping as a hobby to the public নামে। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হলো হেনরি.ডি.বাটলারের লেখা বই The Family Aquarium যা ছিল আমেরিকার সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ অ্যাকোয়ারিয়াম হবি সংক্রান্ত বই। The New York Aquarium Journal ছিল ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হওয়া সর্বপ্রথম অ্যাকোয়ারিয়াম সংক্রান্ত ম্যাগাজিন। ইতিমধ্যে জার্মানি আর আমেরিকায় গড়ে উঠেছে একুয়ারিস্ট সোসাইটি। কিন্তু যতোই পাবলিক অ্যাকোয়ারিয়াম গড়ে উঠুক আর লেখালেখি হোক,মাছ পোষা তখনো সাধারণ লোকের ক্ষমতার বাইরেই ছিল। ট্যাঙ্ক তৈরি, ট্রপিকাল ফিশ রাখতে গেলে তলায় আগুনের শিখা দিয়ে জলের উষ্ণতা বজায় রাখা, এসবই এই শখকে বড়লোকের অন্দরমহলেই আটকে রেখেছিল।

১৯৯১ সালে মস্কোয় মাছের আদান-প্রদান।
ছবিসৌজন্য- গ্লাসবক্স হিস্টরি পেজ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অ্যাকোয়ারিয়াম হবিতে আরো একটা জোয়ার আসে যার প্রধান কারণ ছিল এয়ার পাম্পের প্রথম প্রয়োগ। প্রথমদিকে ইলেক্ট্রিসিটির পরিবর্তে রানিং ওয়াটারের ফ্লো কে ব্যবহার করে এই পাম্প চালানো হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইলেক্ট্রিসিটি কিছুটা সহজলভ্য হওয়ায় ইলেক্ট্রিসিটির মাধ্যমেই পাম্প চলতে থাকে। তার সাথে সাথে আস্তে আস্তে ইলেক্ট্রিকের সাহায্যে আলো, হিটার এগুলোর ব্যবহার হতে থাকে। এর আগে অ্যাকোয়ারিয়াম হবি হিসাবে জনপ্রিয় হলেও এই সময় থেকে সমাজের উচ্চশ্রেণী ছাড়াও মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা মনে করতে থাকে যে তাদের পক্ষেও অ্যাকোয়ারিয়াম করা সম্ভব! ১৯২৫ সালের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঁচ সামলেও গোটা পৃথিবীতে প্রায় ৪৫ টা পাবলিক অ্যাকোয়ারিয়াম গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৮ সালে সেন্ট অগাস্টাইনে স্থাপিত হয় প্রথম ফিশ ওসেনারিয়াম যেখানে বিশালাকায় সামুদ্রিক মাছের সাথে থাকতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডলফিনরাও! ব্যক্তিগত পরিসরেও সেই সময় স্থানীয় মাছ রাখার প্রবণতা বাড়তে থাকে,আর সাথে অবশ্যই থাকতো গোল্ডফিশ! বাইরের মাছ রাখার সামর্থ্য থাকলেও অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়াতো মাছ নিয়ে আসার সমস্যা। প্রথমদিকে বিভিন্ন আকৃতির জারের মাধ্যমে,ফুট পাম্পের সাহায্যে তাতে হাওয়া চলাচল করিয়ে মাছ পরিবহন করা হতো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর সময়কার একুয়ারিয়াম।
ছবিসৌজন্য- গ্লাসবক্স হিস্টরি পেজ।

তারপর ১৯৫০ সাল নাগাদ প্লাস্টিকের ব্যাগের প্রচলন হওয়ায় মাছের পরিবহন বেশ সহজলভ্য হয়ে যায়। ওই পঞ্চাশের দশকে আরো দুটো জিনিস হয় যা অ্যাকোয়ারিয়াম হবিকে আরো কয়েকধাপ এগিয়ে দেয়। একটা হল আন্ডারগ্র্যাভেল ফিল্টারের আবিষ্কার আর দ্বিতীয়টা হলো মাছের জন্য কৃত্রিম খাদ্যের প্রয়োগ। ষাটের দশকে টার ও সিলিকন আবিষ্কারের সুযোগ নিয়ে মার্টিন হরোউইচ নামে এক মার্কিন ভদ্রলোক প্রথম পুরো কাঁচের একুয়ারিয়াম তৈরী করে একুয়ারিয়ামকে আধুনিক রূপ দিলেন। এর ফলে আরো একটা সুবিধা হলো। এতোদিন ধাতুর ফ্রেমের জন্য লবণাক্ত জলের ট্যাঙ্কে বিভিন্ন অসুবিধা দেখা দিতো,কিন্তু পুরো কাঁচের ট্যাঙ্ক সে অসুবিধাকেও দূরে সরিয়ে দিল। এই সময় থেকে জাপান অ্যাকোয়ারিয়াম হবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিতে থাকে। অ্যাকোয়ারিয়ামের বিভিন্ন যন্ত্র সহজলভ্য করা থেকে জনগণের মধ্যে মাছ পোষার উন্মাদনাকে ছড়িয়ে দিতে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপানের জুড়ি মেলা ভার। বর্তমানে এশিয়া,ইউরোপ আর বিশেষ করে উত্তর আমেরিকায় সর্বাধিক অ্যাকোয়ারিয়াম হবিস্টদের দেখা মেলে!

সাল ১৯৬৩। ঘরের একুয়ারিয়ামে জল পালটানোর ছবি।
ছবিসৌজন্য- গ্লাসবক্স হিস্টরি পেজ।

এই তথ্যভিত্তিক ইতিহাসের অন্যতম লক্ষ্যণীয় দিক হল মানুষের মাছের প্রতি ক্রমবর্ধমান ভালোবাসা! আর এখন সেটা শুধুমাত্র মাছেই আটকে নেই,আরো ব্যাপ্ত হয়ে এই ভালোবাসা পরিণত হয়েছে প্রকৃতিকে ভালোবাসায়। আর তাই ফিস কিপিং হবিতে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছে বায়োটোপের মত টার্ম যার উদ্দেশ্য হল শুধু মাছ পোষা নয়,সেই অঞ্চলের প্রকৃতিকে ভালোবেসে তাকে রিক্রিয়েট করা যাতে মাছ ভালো থাকতে পারে! আর এই যান্ত্রিক সময়ে দাঁড়িয়ে অ্যাকোয়ারিয়ামের ইতিহাস যদি আমাদের এটুকুও শিখিয়ে দিয়ে যায় যে মানুষের সাথে প্রকৃতির প্রাথমিক সম্পর্কটাই ভালোবাসার,নির্ভরশীলতার,আর সেটা ক্রমবর্ধমান, তাহলেই এই ইতিহাস পর্যালোচনা সার্থক। ভালো থাকুন,মাছ তথা প্রকৃতিকে ভালোবাসুন।

অরিত্র ভট্টাচার্য্য

মেছোবই এর দ্বিতীয় পর্বে লিখে প্রকাশ করতে চান মাছের প্রতি আপনার ভালোবাসার গল্প? অথবা দিতে চান কোনো বিজ্ঞাপন? তাহলে আর ভাবনা কিসের? কি-প্যাডে আঙুল চালান আর দ্রুত পাঠিয়ে দিন আমাদের অফিসিয়াল মেইল আইডি তে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন নীচের যেকোনো একটা নাম্বারে।

মেইল আইডি
piratesden2017@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ নং
9903569935
9333150179
9679747900

প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের সহজপাঠ

চিত্র সৌজন্য ঃ বিকাশ আগরওয়াল

পাইরেটস' ডেনে আমার বেশ কয়েকটি লেখালিখি আছে। তাদের মধ্যে থেকে এই লেখাটিকে ঝাড়াই বাছাই করে মেছো বইয়ের প্রথম সংখ্যায় দিলাম। লেখাটি যখন হাত থেকে বেরিয়েছিল তখন সেটা ছিল শুধুমাত্র ফেসবুক পাঠকের কথা মাথায় রেখে। তাও তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত। এখন বইয়ের দু'মলাটে (সে হোকই না ই-বুক) সেটিকে বন্দী করতে হলে সামান্য একটু খুঁত যে থাকবে না তা নয়, কিন্তু তাতেও আমি মূল লেখাটিকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে দিলাম। আশাকরি আপনাদের ভালো লাগবে।

এবার একটু নিবন্ধটির কথায় আসি। পাইরেটস' ডেনে এই লেখাটি যে বিভাগের অন্তর্ভুক্ত তার নামখানা বেশ মজার। Aquarium without rocket science। মানে এককথায় বলতে গেলে, এই বিভাগের লেখালেখিগুলো শুধুমাত্র নতুনদের জন্য। এই নিবন্ধগুলো টেকনোলোজির জটিলতা, বিজ্ঞানের লাল চোখকে যতদূর সম্ভব বাইপাস করে সহজ সরল ভাষায় অ্যাকোয়ারিয়াম করার বুনিয়াদি সুলুকসন্ধান দিয়ে থাকে। এই লেখাটা থাকছে প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক নিয়ে।

অ্যাকোয়ারিয়ামের রকমফের তো বড় একটা কম না, কিন্তু তাতেও যত রকমের অ্যাকোয়ারিয়াম হয় তার মধ্যে সবথেকে মনোলোভা বোধহয় প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক। অন্তত আমার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই! জলভরা কাঁচবাক্সের মধ্যে সবুজ সতেজ গাছের বাড়বাড়ন্ত, কোথাওবা পাথরকে জড়িয়ে থাকা কাঠের গা'বেয়ে মসের বেড়ে ওঠা। মনে মনে কোনো এক আদিম রহস্যময় দুনিয়ায় হারিয়ে যাওয়ার এরকম অমোঘ আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে থাকা মুশকিল।

সুতরাং 'একটা প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক করবো' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে নতুন হবিস্টদের খুব বেশি সময় লাগেনা। তারপর ট্যাঙ্ক, বালি, পাথর, কাঠ এবং গাছ কিনে প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক শুরু করার যা অপেক্ষা। গোলটা বাধে এর পর। গাছে ^ পাতা কেন হলুদ হয়ে যাচ্ছে? পাতা কেন গলে যাচ্ছে? জল কেন সবুজ রঙের? এরকম হাজারো সমস্যা এসে জড়ো হয়। আর প্রশ্নগুলোর থেকে তার উত্তর যে জটিল হবেই হবে এটা তো চিরকালীন সত্য!!! আর উত্তরগুলো যদি হয় লাইট ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি কি বোটানি ঘেঁষা! যদি মনে হয় ফোটন কণা কিভাবে ক্লোরোফিলকে অ্যাক্টিভেট করে সেটা না বুঝলে প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক হবেনা! যদি মনে হয় parts per million কষতে না পারলে গাছ বাঁচানো সম্ভব নয়! তবে আর কি? সোনায় সোহাগা!

এরপর পরিণতি দুটো। হয় আপনি যাবতীয় বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে জ্ঞানসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন এবং পরবর্তীতে প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কে সফলতা পেলেন। নতুবা প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ককে বেশ উচ্চ লেভেলের চ্যাপ্টার বিবেচনা করে দূরে সরিয়ে রাখলেন এবং চিরকালই অ্যাকোয়ারিয়ামের এক কোনায় একটা জীর্ণ আমাজন সোর্ড কি অ্যালগি মাখানো আনুবিয়াস রেখে 'আমি কাঁটাতারেই সুখী' গান ধরলেন! আজ পাইরেটস' ডেনের আলোচনা শুধুমাত্র ওই দ্বিতীয় শ্রেণীর হবিস্টদের জন্য। তাই বলে কি আমি তাদের ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি বোঝাবো!!! মোটেই না। দেখাই যাক না, অতিরিক্ত জ্ঞানের কচকচানির মধ্যে না থেকে প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের চাকা গড়ায় কিনা! এই 'গড়ানো' টা খুব দরকারি। কারণ গড়ালে তবেই তো পরে গতি তোলার সুযোগ আসবে!!!

যারা প্রথমবার প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক শুরু করতে চান কিংবা যাদের প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক শুরু করেও সাফল্যের মুখ অধরাই রয়ে গেছে তাদের উদ্দেশ্যে বলি, শুরুতেই যে কটা বিষয় মাথায় রাখতে সেগুলোর একটা তালিকা বানিয়ে নেওয়া যাক, তারপর নাহয় বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা যাবে....

১) ট্যাঙ্ক সাইজ
২) ফিল্টার
৩) সাবস্ট্রেট
৪) লাইট
৫) কার্বন ডাই-অক্সাইড
৬) ফার্টিলাইজার
৭) জল

এবার দেখা যাক এই বিষয়ভিত্তিক সবথেকে সাধারণ প্রশ্নগুলো এবং তাদের সহজ উত্তর কি হতে পারে....

১) ট্যাঙ্ক সাইজ কি করবো?

আপনার বাজেট আপনিই সবথেকে ভালো বুঝবেন, আমি শুধু ক'টা সুবিধা অসুবিধা বলবো। সাইজ যত বাড়াবেন রিকোয়ারমেন্ট তত বাড়বে। ফিল্টার, লাইট, সাবস্ট্রেট, কার্বনডাইঅক্সাইড, ফার্টিলাইজার সবকিছুর। আমার মতে মাঝারি মাপের ট্যাঙ্ক দিয়ে শুরু করা ভালো। দেড় ফুট, দুই ফুট সবথেকে ভালো আর আড়াই ফুটের ওপর শুরুতে না ওঠাই ভালো। ছোটও করতেই পারেন কিন্তু মনে রাখবেন সাইজ যত ছোট হবে সেই ট্যাঙ্কের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। ট্যাঙ্ক হাইট যত বাড়বে জলের মধ্যে দিয়ে আলোর প্রবেশ ক্ষমতা তত কমবে। শুরুতেই তাই একফুট বা বারো ইঞ্চির বেশি হাইটের ট্যাঙ্কে গিয়ে লাভ নেই। কম হতেই পারে কিন্তু বাড়িয়ে বিশেষ লাভ নেই।

২) কি ফিল্টার ব্যবহার করবো?

এখানে কিন্তু একটু অঙ্ক কষতেই হবে। ঘাবড়াবেন না, জটিল কিছু না! হিসেব করতে হবে আপনার ট্যাঙ্কের জলধারণ ক্ষমতা। গুগলে 'tank water volume

calculator' সার্চ দিলে অঙ্ক কষা থেকে বেঁচে যাবেন। এবার খেয়াল রাখুন জলধারণ ক্ষমতা যত বাড়বে আপনার ফিল্টার যেন তার অন্তত দশগুণ জল এক ঘন্টায় পরিশুদ্ধ করতে পারে। ধরুন আপনার ২৪"x১২"x১২" ট্যাঙ্কে আন্দাজ ৫৫ - ৫৬ লিটার জল ধরে। সুতরাং ফিল্টার হতে হবে এমন যার মধ্যে দিয়ে ঘন্টায় অন্তত ৫৫০ - ৬০০ লিটার জল পাস করে। ফিল্টারের এই ক্ষমতাকে liter per hour (lph) বলে, যা প্রতি রকমের ফিল্টারে (স্পঞ্জ ফিল্টার বাদে) উল্লেখিত থাকে। সুতরাং কেনার সময় দেখে নেবেন।

এরপর আসে কি ফিল্টার নেবেন। নানারকমের ফিল্টারের নানা রকমের কার্যপ্রণালী। কিন্তু একটা জিনিস মোটামুটি বলা যায়, যে ফিল্টারে জল যত ছিটকায় প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কে তার কার্যকরীতা তত কম। জল যত ছিটকোবে জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড (যা জলের গাছের জন্য প্রয়োজনীয়) তত নষ্ট হবে এবং জলে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়বে। তাই কার্যকারিতার মাপকাঠিতে প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কে ফিল্টারের যদি কোনো ক্রমতালিকা হয় তবে তা খানিকটা এমন হবে,

ক্যানিস্তার ফিল্টার
হ্যাঙ্গ অন ব্যাক (HOB) ফিল্টার
ইন্টারনাল পাওয়ার ফিল্টার (IPF)
স্পঞ্জ ফিল্টার
টপ ফিল্টার

এখন ক্যানিস্তার ফিল্টারের বাজেট একটু বেশির দিকে। শুরুটা ক্যানিস্তার দিয়ে করতে না চাইলে পরের দুটো অপশন বেছে নিতে পারেন। IPF ব্যবহার করলে সাথে লাগানো পাইপ যা জলে এয়ার সাপ্লাই দেয় সেটি খুলে দেবেন। আর মনে রাখবেন ফিল্টার চলবে ২৪ x ৭, ট্যাঙ্ক মেন্টেনেন্স বাদে বন্ধ করার দরকার নেই।

৩) বালিতে গাছ হবে? নাকি মাটি লাগবে?

সিমেন্ট মাখানোর পাতি বালিতেই গাছপালা হয়। কিন্তু মাটিতে আরো ভালো হয়। প্ল্যান্টেড অ্যাকোয়ারিয়াম করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি মাটি পাওয়া যায়। যেগুলোর সব থেকে বড় গুণ জলে গুলে যায় না। তাছাড়া এগুলোতে গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ আছে, কিছু কমার্শিয়াল মাটি জলের অম্লত্ব-ক্ষারত্বের মাত্রাকে সাম্যাবস্থায় রাখতে পারে। সব মিলিয়ে এই কমার্শিয়াল মাটিগুলো প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

কিন্তু দামটাও ওপর দিকে। দুই ফুটের ট্যাঙ্ক করতে দুই-তিন হাজার টাকা খরচ পড়েই যাবে। তবে কি করণীয়? শুরু করতে পারেন আপনার বাগানের মাটি দিয়ে। প্রথমে বড় ঢেলা ভেঙে বাগানের মাটিটাকে ঝুরঝুরে করে ফেলুন। তারপর মাটিটা পরিষ্কার করে নিন। মাটি থেকে প্লাস্টিক, নুড়ি, ইঁটের টুকরো, শামুকের খোল, শেকড়-বাকড় আলাদা করে ফেলুন। এবার একটা কড়ায় মাটিটাকে অল্প আঁচে গরম করুন। গরম করার ফলে মাটিতে থাকা ফাঙ্গাস, ব্যাকটেরিয়া, অনুজীব, পোকা মাকড়, তাদের ডিম লার্ভা পিউপা নষ্ট হয়ে যাবে, পরবর্তীকালে কোনো সমস্যা হবেনা। অভিজ্ঞতা থেকে একটা পরামর্শ দিই, রান্নাঘরে ঢুকে কড়ায় মাটি ভাজার কাজ গোপনে করবেন, নতুবা গৃহশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার তুমুল সম্ভাবনা।

এবার মাটি রেডি। ট্যাঙ্কে এক ইঞ্চি পুরু করে মাটিটা বিছিয়ে দিন, তার ওপর আরো এক ইঞ্চি বালির লেয়ার দিন, নাহলে জলের সংস্পর্শে এলে মাটি গুলবে। বালির বদলে খুব ছোট বালির পাথর ব্যবহার করতে পারেন, যার পোষাকি নাম 2mm sand gravel, আমার মতে এর কার্যকারিতা বালির থেকে বেশি। তারপর ট্যাঙ্কে ধীরে ধীরে জল ঢালুন। বালিটাকে হালকা হাতে আঁচড়ে দিয়ে বালির খাঁজে জমে থাকা এয়ার বাবলকে বার করে দিন। চালিয়ে দিন ফিল্টার। তারপর আবার বাকি জিনিসপত্র নিয়ে ভাবতে বসি।

৪) কত ওয়াটের লাইট লাগবে?

একটা প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক দেখলে এই প্রশ্নটা বোধহয় নতুন হবিস্টের মাথায় সবার আগে আসে! হ্যাঁ প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক করলে উজ্জ্বল লাইট লাগে, কিন্তু ওয়াটটা তার ঔজ্জ্বল্যের সূচক নয়। 'ওয়াট' বোঝায় লাইটটা জ্বালাতে কতটা বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে। তবে বালব থেকে নির্গত আলো কি দিয়ে মাপবো? দেখবেন যেকোনো বালবের বাক্সে একটা লুমেনের (lm) পরিমাপ লেখা আছে। এবার আর একটা ছোট্ট অঙ্ক কষতে হবে। হিসেব করতে হবে আপনার ট্যাঙ্কের প্রতি লিটার জলে কত লুমেন আলো পাচ্ছে। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝালে ব্যাপারটা সোজা হবে। ধরা যাক, একটা ৯ ওয়াটের বালবের গায়ে লেখা দেখলেন ৮৫০lm, আপনার দুই ফুট ট্যাঙ্কে জল ধরে ৫৫লিটার। তাহলে প্রতি লিটার জল কত লুমেন আলো পাচ্ছে? ৮৫০÷৫৫= ১৫.৫ লুমেন প্রতি লিটার। এবার মোটামুটি লো থেকে হাই লাইটের মাপকাঠিটা এরকম...

১০ - ১৫ লুমেন/লিটার = লো লাইট
২০ - ৪০ লুমেন/লিটার = মিডিয়াম লাইট
৪০ লুমেন/লিটার = হাই লাইট

কি গাছ করতে চান, তাদের চাহিদা কি, সেই অনুযায়ী এবার হিসেব করে নিন কেমন লাইট চান আপনি। আমার মতে শুরুতে মধ্যপন্থা সবচেয়ে ভালো, মিডিয়াম লাইট দিয়েই নাহয় শুরু করুন। অনেকে লুমেন/স্কোয়ার ইঞ্চি দিয়েও আলোর পরিমাপ করেন। আরো এগিয়ে থাকা হবিস্টরা (PAR Photosynthetic Active Radiation) দিয়েও আলোর বিচার করেন। প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের জন্য বানানো কমার্শিয়াল লাইটে সেসবের উল্লেখও থাকে। কিন্তু আমরা শুরুতেই অঙ্গীকারবদ্ধ বিজ্ঞানের কচকচানিতে আপাতত মাথা গলাবো না। ধাপে ধাপে উন্নতি করা যাবে, এক লাফে চাঁদে উঠতে গেলে ব্যর্থ হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা।

আর দুটো জিনিস বলে রাখি লাইট সম্বন্ধে। লাইটের একটা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হল 'কালার টেম্পারেচার', যা মাপা হয় কেলভিন (K) দিয়ে। প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের জন্য ৬৫০০K বা তার বেশি লাইট চাই। ৬৫০০K এর নীচে নামলে আলোতে লালচে ভাব বাড়তে থাকে, ওপরে উঠলে বাড়ে নীলের পরিমাণ। আপাতদৃষ্টিতে আমরা যে সাদা (cool white) এলইডি বালব বা টিউব দেখি সেসবের কালার টেম্পারেচার ৬৫০০K, সুতরাং সাধারণ সাদা এলইডি বালব বা টিউবেই প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক বানিয়ে ফেলতে পারেন।

এরপরই আসে লাইট কতক্ষণ জ্বলবে সেই প্রশ্ন। জ্বলুক না মোটামুটি ছয়-আট ঘন্টা। তবে ফটোপিরিয়ড মেনটেন করাটা উচিত। আজ বাড়ি আছি তাই দুপুর দু'টো থেকে রাত আটটা লাইট জ্বালালাম, আর কাল রাতে ফিরবো তাই তারপর লাইট জ্বলাবো, এ জিনিস না করাই ভালো। একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করুন সেই সময় মেনে লাইট জ্বলান।

৫) কার্বন ডাই-অক্সাইড কি লাগবে?

যেখান থেকেই পড়ুন না কেন, প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কে প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকায় এই কার্বন ডাই-অক্সাইডের নাম থাকেই। আর এই একটা জায়গায় নতুন প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক প্রেমী এসে হোঁচট খায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। সুতরাং অন্য রাস্তা দেখতে হবে। কি অন্য রাস্তা আছে? Do it Yourself পদ্ধতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বানানোর দুটো উপায় আছে, সুগার-ইস্ট সিস্টেম আর সাইট্রিক অ্যাসিড - বেকিং সোডা সিস্টেম। এছাড়া লিকুইড কার্বন ডাই-অক্সাইড, CO_2 ট্যাবলেট, CO_2 ক্যান ইত্যাদি কিছু প্রোডাক্টও বাজারে অ্যাভেলেবল আছে। যারা কোনো ঝামেলাতেই যেতে চান না তারা খোঁজ করেন কোন গাছের CO_2 লাগেনা।

একটা জিনিস শুরুতেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভালো প্রত্যেক গাছের CO_2 লাগে, গাছ বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে যে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে তা CO_2 ব্যতিরেকে সম্ভব না। সুতরাং CO_2 লাগবেই। আর তার

চিত্র সৌজন্য ঃ সঞ্জীব পাত্র

প্রেশারাইজড কার্বন ডাই অক্সাইড সিস্টেমের
আনুসাঙ্গিক সরঞ্জাম (চিত্র সৌজন্য ঃ দীপ সাউ)

একমাত্র ফুলপ্রুভ পদ্ধতি প্রেশারাইজড সিলিন্ডার। শুরুটা আপনি সুগার-ইস্ট কি সাইট্রিক অ্যাসিড-বেকিং সোডা সিস্টেম দিয়ে শুরু করতেই পারেন। কিন্তু দুটো সিস্টেমেরই কিছু সমস্যা আছে। প্রথমে সুগার - ইস্ট সিস্টেমের কথা বলি...

- সুগার ইস্ট সিস্টেমে রি-অ্যাকশনটা আমাদের কন্টোলে থাকে না। ফলে, CO_2 এর পরিমাণ ওঠানামা করে।
- আয়ু মেরেকেটে এক-দেড় সপ্তাহ, তারপর আবার সব বানাতে হয়।

এবার আসি সাইট্রিক অ্যাসিড - বেকিং সোডা সিস্টেমের ফাঁক ফোঁকরে...
- খুব ভালো জিনিস যদি আপনি সিস্টেমের কার্যপদ্ধতি খুব ভালো করে বোঝেন এবং ত্রুটি - বিচ্যুতি নিজেই ম্যানেজ দিতে পারেন।
- মাসে অন্তত একবার সিস্টেম রিস্টার্ট করার জন্য সময় দিতে হবে।

কিন্তু নিঃসন্দেহে দুটো সিস্টেম দিয়েই প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের প্রাথমিক পাঠটা উতরে যায়। সময় নিন না বছর দেড়েক, চলুক না DIY CO2 সিস্টেম, তলে তলে টাকা জমাতে থাকুন সিলিন্ডারের জন্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লিকুইড কার্বন ডাই-অক্সাইড বলে যে জিনিসটা বাজারে বিক্রি হয় সেটি তরল CO_2 নয়, কারন লিকুইড CO_2 প্লাস্টিকের বোতলে ভরে বেচা যায় না। এই সমস্থ পন্যে মূলত গ্লুটারালডিহাইড নামের একটি রাসায়নিককে কার্বন সোর্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখন বেশ কিছু আর্টিকেল গ্লুটারালডিহাইডকে কার্সিনোজেনিক (যা ক্যানসারের কারণ হতে পারে) হিসেবে বর্ণনা করে। এরপর আপনি ঝুঁকি নেবেন কি না সেটা আপনার ওপরেই ছাড়া ভালো। আর ওই CO_2 ট্যাবলেট যে ছেলে ভোলানো খেলনা সেকথা বলাই বাহুল্য।

তাহলে কি CO_2 ছাড়া প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক হবেনা? গাছের কার্বন ডাই-অক্সাইডের চাহিদার তারতম্য আছে। কিছু শক্ত পোক্ত গাছপালা আছে যারা কম CO_2 কন্ডিশনে আরামসে কাটিয়ে দিতে পারে। বেছে বেছে সেই সমস্থ গাছপালা দিয়ে যদি একটা ট্যাঙ্ক বানান এবং ধৈর্য ধরেন তবে সময় আপনার ট্যাঙ্কে ভারসাম্য এনে দিতেই পারে। কিন্তু CO_2 দেবোনা অথচ আমার সবুজ কার্পেট লাগবে এই দ্বন্দ্ব থেকে বেরোতে হবে।

৬) ফার্টিলাইজার দিতে হবে নাকি?

জীবন্ত জিনিস যখন, তখন তাকে খেতে তো দিতেই হবে। মাছটাছ থাকলে তাদের মলমূত্র অবশ্যই গাছের খাবার (বা সার) হিসেবে কাজ করে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা যথেষ্ট না। জলের তলায় সবুজে মোড়া ঘন ঝোপঝাড় দেখতে হলে গাছের চাহিদা মত খাদ্যের যোগান তো দিতেই হবে।

গাছের বৃদ্ধির জন্য মোটামুটি কুড়ি রকমের খনিজ মৌল প্রয়োজন হয়, যার তিনটে গাছ জল আর বাতাস থেকে জোগাড় করে নেয়। সেগুলো হল অক্সিজেন (O), হাইড্রোজেন (H) আর কার্বন (C)।

বাকি খনিজগুলোকে চাহিদা অনুযায়ী আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যে সমস্থ মৌলের চাহিদা অনেক বেশি, যাদের অভাবে গাছের জীবনচক্র সম্পূর্ণ হবেনা, যাদের অভাব অন্য কোনো বিকল্প উপাদান দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়, তাদের বলা হয় অপরিহার্য খনিজ বা ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট macronutrients । ছ'টা মৌলকে ফেলা হয় ম্যাক্রো-নিউট্রিয়েন্টের মধ্যে, নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P), পটাশিয়াম (K), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), সালফার (S)। এছাড়া লোহা, তামা, দস্তা, বোরন, সোডিয়াম, মলিবডেনাম, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি কিছু খনিজও গাছের পুষ্টিতে সামান্য পরিমানে প্রয়োজন হয়, এদের একসাথে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট ^ (micronutrients) বলা হয়। প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কে ফার্টিলাইজার ডোজিং বলতে এই ম্যাক্রো এবং মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টদের কথাই বলা হয়।

তাহলে কিভাবে দেবেন ফার্টিলাইজার? দুটো উপায়। সহজটা বাজার চলতি কোনো প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কে ব্যবহার করার ম্যাক্রো ও মাইক্রো ফার্টিলাইজার কেনা এবং সেই ব্র্যান্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ডোজিং করা। দ্বিতীয় পথটা হল Estimative Index অনুযায়ী ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত কিছু রাসায়নিকের মাধ্যমে গাছের নিউট্রিয়েন্টের চাহিদা মেটানো। পটাশিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (KH_2PO_4), পটাশিয়াম সালফেট (K_2SO_4) এবং পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO_3), সাধারণত এই তিনটি রাসায়নিক যথাক্রমে ফসফেট, পটাশিয়াম এবং নাইট্রোজেনের সোর্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পদ্ধতিটি একটু জটিল এবং রসায়নিকগুলি জোগাড় করা আরো বেশি জটিল। রাসায়নিক কেনার কিছু আইনি জটিলতাও আছে। তবে রসায়ন এবং গণিতের ন্যূনতম জ্ঞান থাকলে এবং অতি অবশ্যই গাছকে পর্যবেক্ষণ করে তার নিউট্রিয়েন্টের চাহিদা বুঝতে শিখলে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর। সাশ্রয়কারীও বটে। Estimative Index পছন্দ হলে এবং নিজের ফার্টিলাইজার নিজেই বানাতে চাইলে বেশ কিছু ওয়েবসাইটের অনলাইন সার্ভিস আছে আপনাকে সাহায্য করার জন্য, গুগল করে দেখতে পারেন।

৭) কর্পোরেশনের জল দেবো না আন্ডারগ্রাউন্ডের?

আমাদের দেশে প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের এই দিকটা মনে হয় সবচেয়ে অবহেলিত। অনেক এগিয়ে থাকা হবিস্টও যে জল ব্যবহার করছেন সেই সম্বন্ধে অবগত নন। বাকি সব জিনিসের মতো জলও কিন্তু প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের সাফল্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় মাপকাঠি। প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কে সফল হতে গেলে তাই জলের কিছু প্যারামিটার সম্বন্ধে একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন। যেমন - জলে দ্রবীভূত লবণ, মৌল, আয়নের মোট পরিমাণ, Total Dissolved Solids (TDS) এই মানকে নির্দেশ করে। এছাড়া আছে জলের জেনারেল হার্ডনেস (GH), কার্বনেট হার্ডনেস (KH) এবং অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের সূচক PH।

কিন্তু একদম গোড়ার হবিস্টরা যারা সবে প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক শুরু করেছেন বা করতে চাইছেন তারা কি করবেন? তারা কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখুন, গাছ হার্ড ওয়াটারের (খরজল) থেকে সফট ওয়াটার (মৃদুজল) বেশি পছন্দ করে। আপনার এলাকার জল যদি অতিরিক্ত হার্ড হয় তবে RO (Reverse Osmosis) ফিল্টারের জল ব্যবহার করতে পারেন। যদি RO ফিল্টার না থাকে তবে বাজারে কুড়ি লিটারের যে খাবার জলের ড্রাম বিক্রি হয় সেই জল ব্যবহার করতে পারেন। যারা কর্পোরেশনের জল ব্যবহার করেন তারা জল থেকে ক্লোরিন/ ক্লোরঅ্যামিন কিভাবে তাড়াবেন সেই বিষয়টি মাথায় রাখুন। অ্যান্টি ক্লোরিন ব্যবহার করতে পারেন। আগের রাতে ধরে রাখা জলে সারারাত এয়ারস্টোন চালিয়ে রাখলে ক্লোরিনের সমস্যা অনেকটাই মেটে এবং পরেরদিন সেই জল দিয়ে ওয়াটার চেঞ্জ করতে পারেন। কিন্তু পড়াশোনা একটু করতেই হবে সেই ব্যপারে সন্দেহ নেই।

তাহলে এই গেল প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের বুনিয়াদি চাহিদা গুলোর পরিচয়। যতদূর সম্ভব জটিলতা এড়িয়ে বিষয় গুলো আলোচনার চেষ্টা করলাম, যারা প্রথমবার প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক করতে চাইছেন শুধুমাত্র তাদের জন্য।

আরো কিছু বিষয় জেনে রাখুন।....

প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের বিষয়ে জানা এখান থেকে শুরু। প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কে সফল হতে গেলে প্রতিনিয়ত নিজেকে আপগ্রেড করতে হবে এবং সেইজন্য পড়াশোনা এবং জানার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ভুল করতে মোটাও ভয় পাবেননা, কিন্তু কেন হল সেটা জানার চেষ্টা করুন।

প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কে রাতারাতি সফল হওয়াটা খুব কঠিন। অভিজ্ঞতা অর্জন করার চেষ্টা করুন। শুরুতেই স্কেপের পিছনে না দৌড়ে গাছের গ্রোথকে ধরে রাখতে এবং গাছকে বুঝতে চেষ্টা করুন। সচিনের ব্যাটে নিয়ে খেলতে নামলেই সেঞ্চুরি করা যায় না, সেইজন্য খেলতে জানতে হয়। শুরুতেই ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড করে মাথা না ঘামিয়ে কার্যপ্রণালী নিয়ে ভাবাটা বেশি দরকারি।

মেছোবইয়ের প্রথম পর্বে এতটাই নাহয় থাক। দেশী বিদেশি মাছের আর তাদের আবাসভূমির হালহকিকত সম্বন্ধে আরো লেখালিখি পড়ার জন্য এবং আপনাদের অভিজ্ঞতা সবার সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য পাইরেটস' ডেন ফেসবুক গ্রুপের সদস্য হতে আমন্ত্রণ জানাই।

সৌম্য সরকার

সাইকেল: বাই নয়, নাইট্রোজেন!

লেখার শুরুতেই বলে রাখি, তথাকথিত প্রো হবিস্টের থেকেও এই লেখাটা প্রধানত তাদের জন্য যারা এই মাছপোষার জগতে সদ্য আগত। যাদের ইচ্ছে নানা রঙের মাছ রাখার, আর সেই ইচ্ছে পূরণ এর জন্যই যারা নীল লাল মাছের দোকানে গিয়ে ভিড় জমান।

লেখা লিখির অভ্যেস কোনো কালেই তেমন নেই, তাই হাতে পেন, থুড়ি কিপ্যাড ধরে শুরু থেকেই শুরুর সিদ্ধান্ত নিলাম। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করলে মন্দ হয় না।

ঘটনাটা ঘটেছিল আমার বাড়ির কাছাকাছি একটা অ্যাকোয়ারিয়াম এর দোকানে। আমি প্রায়শই সেখানে যেতাম নতুন নতুন মাছের সন্ধানে। তো সেদিনও গেছি, গিয়ে অপেক্ষা করছি দোকানির জন্য, হঠাৎ করে দেখি একটা মাঝ বয়েসী মেয়ে খুব উৎসাহ নিয়ে এসেছে রঙিন মাছ কিনতে। দোকানি ব্যস্ত থাকায় মেয়েটি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত খেলে চলেছে মাছেদের সাথে কাঁচের দেওয়াল এর এপার থেকে। দোকানি ফাঁকা হওয়াতে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন যে সে কি মাছ নেবে?? মেয়েটির সাথে সাথে উত্তর দিলো, 'কমলা রঙের ওই লেজ ঝোলা ঝোলা মাছ এর সাথে এই কালো রং এর মাছ সব মিলিয়ে মিশিয়ে ৪/৫ টা দিয়ে দিন।' সাথে তার

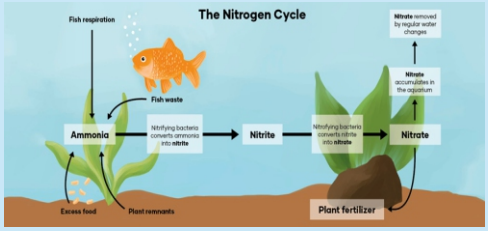

খেলার ছলে নাইট্রোজেন সাইকেল (চিত্র সৌজন্য ঃ গুগুল)

ব্যাগস্থ হলো একটা মাঝারি মাপের কাঁচের বোল, আর মাছের খাবার। সব নিয়ে টাকা মিটিয়ে সানন্দে দোকান ছাড়লো মেয়েটি। মেয়েটি তখনও জানে না মাছগুলো কি পরিমাণ কষ্টে থাকবে ওইটুকু জায়গায়। আমার মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা থেকেই গেল।

বেশ কিছুদিন হলো আমার মাছের খাবারটা শেষ। অগত্যা আবারও ওই দোকানে গিয়ে পৌঁছালাম। হঠাৎই দেখি সেই দিন এর সেই মেয়েটি! তার কথা মতো তার নাকি আবার কমলা কমলা বড়ো বড়ো লেজ ঝোলা মাছগুলো চাই। প্রায় কিছুটা বাধ্য হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার আগের গোল্ডফিশ গুলো কি হলো??' উত্তর এলো, 'একটা মাছও বেঁচে নেই।' প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যেই সব গুলো মারা গেছে। তাই

শূন্যস্থান পূরণ এর জন্য নতুন মাছ কেনা। দোকানিও তার মতো করে পুনরায় মাছ গুলো দিয়ে দিলো।

বুঝলাম ভুল টা গোড়াতেই, আমরা মাছ রাখতে পছন্দ করি ঠিকই, কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো মেনে চলি না। তাই বেসিক কিছু স্টেপস ফলো করা জরুরী। তার মধ্যে সব থেকে প্রয়োজনীয় হলো নতুন অ্যাকোয়ারিয়ামে, মানে একদম নতুন ফিল্টার সমেত নতুন ট্যাঙ্ক সেটাপের ক্ষেত্রে জল সাইকেল করা।

ট্যাংক সাইকেল করার উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- উপকারী ব্যাক্টেরিয়া কলোনি তৈরি করা। সেটা ফিল্টার এ হতে পারে, সাবস্ট্রেট এ হতে পারে বা অ্যাকোয়ারিয়াম এর দেয়ালেও হতে পারে।
- মাছ এবং জলজ প্রাণী দের মল বা ওয়েস্ট ফুড জলের মধ্যে বিয়োজিত হয়ে ammonia উৎপন্ন করে। এই ammonia খুব ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত, যা মাছেদের মৃত্যুর কারণ হয়।
- আমাদের এই উপকারী ব্যাক্টেরিয়া আর একটা হলো নাইট্রোসমনাস। যেটা ammonia কে একটু কম বিপদজনক নাইট্রাইট এ পরিণত করে, তারপর আসে আর এক ব্যাক্টেরিয়া যেটা হলো নাইট্রোব্যাক্টর, যারা এই নাইট্রাইট কে ভেঙে নাইট্রেট বানায়, যা শ্যাওলা এবং উদ্ভিদরা খাবার হিসেবে ব্যবহার করে।
- তাই এই সাইকেলটা ঠিকঠাক প্রতিষ্ঠিত না হলেই ট্যাংক এ ammonia পয়েজনিং হতে পারে আর সে কারণে মাছ মরতে পারে। সেটা সমস্ত নতুন ট্যাংক এর একটা বেসিক চাহিদা।

সেইজন্য মোটামুটি একটা নতুন ট্যাংক (ধরে নিচ্ছি সব কিছুই নতুন- জল, ফিল্টার, সাবস্ট্রেট।) কম বেশি একমাস লাগে সাইকেল হতে। তবে বাজার চলতি এমন কিছু প্রোডাক্ট ব্যবহার করে জাম্পস্টার্ট করাই যায়, তবুও মিনিমাম ৩ সপ্তাহ হলে খুব ভালো হয়।

এখন কেউ বলতেই পারে, কেন মাছের দোকানদার এত কিছু বলে না?? উত্তরটা সহজ, তুমি যদি পরে আর মাছ না আনতে আসো।

তাই পরেরবার অ্যাকোয়ারিয়াম সেট করার আগে সবার প্রথম সাইকেল করতে ভুলোনা কিন্তু।

সঞ্জীব পাত্র।

For Creation and Maintenance of Natural Pond, Artificial Pond, Lily Pool, Koi Pond and other Aquascapping, Landscaping, creation of Urban Forest, Orchard, Kitchen Garden, Roof Garden

Contact

BioMates

6/7 Bijoygarh, Kolkata 700032. Dial: 9874357414/9477275731

for a beautiful world
BioMates

সোনালী মহাশোল

আপনারা Man-Eaters of Kumaon পড়েছেন তো? বা Man eating Leaopard of Rudraprayag জিম করবেটের লেখা? মনে আছে, করবেট সাহেবের প্রিয় শখ কি ছিল? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, মাছ ধরা। এবার প্রশ্ন করি, কোন মাছ ধরতে উনি সবথেকে বেশি ভালো বসতেন? উত্তর আসবে, মহাশোল।

আজকে আমার লেখার বিষয়টাও ওই মহাশোল নিয়ে। খুব ছোটবেলায়, যখন এই মহাশোল নাম টা শুনি, তখন আমার খুব ইচ্ছে ছিল জিম করবেট হবার। বাচ্চা বয়সের ফ্যান্টাসি আরকি। যাই হোক, পরবর্তী কালে বন এবং বন্য প্রাণী নিয়ে একটু আধটু কাজ শুরু করি এবং সর্বোপরি মাছ এর ওপর এক তুমুল আগ্রহ জন্মায়, তখন বুঝতে পারি এই তথাকথিত মহাশোল মাছ তার নিজস্ব habitat এ না দেখতে পেলে জীবন বৃথা।

মহাশোল বা Golden Mahseer (*Tor putitora*) ভারতবর্ষে প্রাপ্ত স্বাদু জলের বৃহৎ মাছ গুলির অন্যতম। এরা এতটাই বড় হতে পারে যে প্রায় ২.৭ মিটার অব্দি লম্বা হয়, যদিও মোটামুটি ৫৫-৬৫ সেমি লম্বা হয়ে থাকে। অসমীয়া ভাষা তে জঙ্গাপিথিয়া বা হিমাচলের ভাষায় মহসির বলা হলেও বাংলা ভাষায় একে মহাশোল বলা হয়ে থাকে, এবং নেপালী ভাষাতেও সম্ভবত তাই। শরীরের রং গাঢ় সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল মেশানো, পাখনা সবজে কমলা। সব মিলিয়ে জলের তলায় সোনালী রঙের একটা মাছ, তাই এরূপ নামকরন। মোট আটটি উপপ্রজাতি যুক্ত মহাশোল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিশাল শরীর, সরু লম্বাটে মাথা এবং হলুদ বক্ষ ও শ্রোণী পাখনা। জলের প্রকৃতির ওপর অনেক টাই নির্ভর করে এদের দেহের রং কেমন হবে। ২ জোড়া শুঁড় বা Barbel থাকে, যার Rostral টা maxillary এর থেকে ছোট হয়।

বেশ কয়েকবার মহাশোল দেখার সুবাদে এদের সম্পর্কে যেটা বুঝেছি যে এরা কখনো কখনো একা থাকলেও দলবদ্ধ জীব, ঝাকে থাকতে ভালবাসে। মনে পড়ে, রামগঙ্গার তীরে এক নভেম্বরের শীতল সকালে উজ্জ্বল রোদে দাড়িয়ে আছি। আর রামগঙ্গার নীল জলে সাঁতার কাটছে প্রায় একশো মহাশোলের এক দল। নীল জলের সেই অংশ টা থেকে থেকে থেকে ঝলক দিচ্ছে সোনালী বিদ্যুৎ। সে এক অনন্য অনুভূতি।

এরা cyprinidae বর্গ এর অন্তর্গত, অর্থাৎ ঠিক যে বর্গে কার্প জাতীয় মাছ যেমন রুই, কাতলা, মৃগেল র থাকে। Mahseer কথাটার আক্ষরিক অনুবাদ হল বিশাল আকৃতির মাথা, তাই হয়তো বেশ কিছু বইয়ে একে big mouth বলা হয়েছে। আয়ু সম্পর্কে বিশেষ তথ্য না থাকলেও গড় আয়ু ২০-২৫ বছর ধরা হয়।

প্রথমে যদিও বলেছি ভারতবর্ষ, কিন্তু আসলে উপমহাদেশের অনেকাংশেই পাওয়া যায় এই মাছ কে, যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল। বিশেষত পার্বত্য নদী এদের প্রধান পছন্দের হওয়ায় অলকানন্দা, কুশি, রাম গঙ্গা, কালী, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু এই সব নদীতে এদের যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যে সকল নদীতে স্রোত অত্যন্ত বেশি এবং যার তলদেশে পাথর ভর্তি, অর্থাৎ অক্সিজেন ভর্তি খরস্রোতা নদী। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, যে লেখার সাথে যুক্ত ছবি রাম গঙ্গা নদীতেই তোলা।

এপ্রিল থেকে জুলাই মাস এদের প্রজননকাল। আদর্শ তাপমাত্রা ১৫-১৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পরিনত মাছেরা স্রোতের বিপরীতে সাঁতরে প্রজনন করে এবং জলের ৩০-৩৫ সেমি নিচে, পাথরের তলায় বাদামি রঙের ডিম পাড়ে। সেখান থেকে জুলাই বা আগস্ট মাসে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। শীতকালে এরা পরিযায়ী হয় অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলের দিকে। এদের ঘ্রাণ শক্তি অসাধারণ, অনেকদূর থেকে খাবারের গন্ধ পায়, এবং মূলত মাংসাশী। খাদ্যতালিকায় মাছ, কম্বোজ জাতীয় প্রাণী থাকে। দুর্দান্ত সাঁতারু মহাশোল স্রোতের বিপরীতে অনায়াসে সাঁতার কাটে, এবং চোখের নিমেষে ২০-১৫ নট (knot) গভীরে চলে যেতে পারে।

অত্যন্ত খেলুড়ে প্রকৃতির হওয়ায় এবং অত্যন্ত স্বাদু হওয়ায় মৎস্যজীবীদের এবং মাছ ধরিয়েদের মধ্যে মহাশোলের চাহিদা অত্যন্ত বেশি।

সাধারণত বড় দলে ঘুরে বেড়ানো মহাশোল কিন্তু আজ বিপন্নতার মুখে। অতিরিক্ত শিকার এবং নগরায়নের এর ফলে ভারতবর্ষের বেশির ভাগ জায়গাতেই এদের আর দেখা মেলেনা। এছাড়াও আরেকটা কারণ হল, এই মাছ জলের প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। এই সব কারণে একদিকে যেমন মহাশোল এর সংখ্যা কমেছে, ঠিক সেরকম আয়তন ও কমছে। আজ থেকে ৫০ বছর আগের পাওয়া মহাশোল দের মত বিশাল আয়তন এর সদস্য এখন সেরকম ভাবে পাওয়া যায় না। বর্তমানে IUCN এর তালিকায় এরা Endangered তালিকাভুক্ত।

নদী ছাড়াও বিশাল কিছু পুকুরে (বিশেষত নেপাল এবং উত্তর পূর্ব ভারতের) এদের পাওয়া যায়। তবে মনে করা হয় এটা ওদের স্বাভাবিক বাসস্থান নয়, এদের পূর্বপুরুষ দের এখানে ছাড়া হয়, এবং তারপর তারা বংশবিস্তার করে। সাধারণত মন্দির সংলগ্ন পুকুরেই এদের পাওয়া যায়, বিষ্ণুর মীন অবতার হিসেবেই হয়তো। উত্তর ভারতের বেশ কিছু মন্দিরের সাধকরা প্রতিদিন নদীতে খাবার ছড়ান মহাশোল দের জন্য। স্বাভাবিক ভাবেই নদীর সেই ভাগে (বিশেষত অলকানন্দা ও মন্দাকিনী) মহাশোল এর সংখ্যা এবং ঘনত্ব বেশি হয়।

ভারতবর্ষে আইনত মহাশোল শিকার দণ্ডনীয় অপরাধ। যে সকল দেশে এদের শিকার করা হয়, সেখানেও এপ্রিল থেকে জুলাই বা সেপ্টেম্বর অব্দি এদের ধরা বন্ধ থাকে।

চাহিদা অত্যন্ত বেশি হওয়ায় এবং সংখ্যা উদ্বেগজনক ভাবে কমতে থাকায় আমাদের দেশের সরকার ছাড়াও অন্যান্য দেশেও মহাশোলের কৃত্তিম প্রজনেনর ওপর হালে গুরুত্ব দিয়েছে। ভারতের সিমলায় এবং উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে বা উঠবে মহাশোল এর প্রজনন কেন্দ্র।

বলা হয়, গত ৫০ বছরে মহাশোল এর সংখ্যা সারা পৃথিবীতে ৫০ শতাংশ কমেছে। চোরা শিকার বন্ধ না হলে, নদীতে দূষণ বন্ধ না হলে, নগরায়ণ বন্ধ না হলে, মানুষ আরো সচেতন না হলে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়ত ওই মন্দিরে গিয়েই মহাশোল দেখবে। বঞ্চিত হবে এক শীতের সকালে রামগঙ্গা এর পাড়ে বসে নীল জলের মধ্য দিয়ে ১০০-১৫০ মহাশোল এর জলকেলি থেকে, নীল এর মধ্যে সোনালী বিদ্যুতের চমক থেকে।

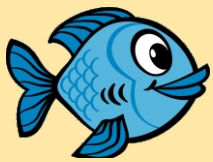

সপ্তর্ষি মুখার্জী

কালো মাছের আলো

যদি প্রশ্ন করা যায় প্লান্টেড অ্যাকোয়ারিয়ামে ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায় এরকম কোন কোন মাছ আপনার সবচেয়ে প্রিয়? এর উত্তরে বেশিরভাগ মেছো যেসব মাছের কথা বলবেন তার মধ্যে একটা বড় অংশ নিশ্চয়ই ব্ল্যাক নিয়ন টেট্রার (*Hyphessobrycon herbertaxelrodi*) নাম নেবেন। কারন মাছটির অত্যন্ত সুন্দর প্যাটার্ন এবং ঝাঁক বেঁধে ঘোরাঘুরির ক্ষমতা। ঘন গাছের ঝোপ হোক বা বায়োটোপের ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড, কালচে দেহের উপর সাদাটে পার্শ্বরেখা, সাথে লাল চোখের রিং যে কারোর নজর কাড়তে বাধ্য। তবে মাছটি যেহেতু ছোট (১-১.৫ ইঞ্চি) তাই একঝাঁক না হলে ঠিক মানানসই লাগে না। পরিস্কার স্বচ্ছ জল এবং ভালো ফিল্ট্রেশন মাছটির আয়ু ১০ বছর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। প্রকৃতিতে সর্বোচ্চ আট বছরের আয়ুর কথা জানা গেলেও উপযুক্ত আদর-যত্ন এদের আরো বেশি বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

চিত্র সৌজন্য ঃ গুগুল

উৎপত্তি :

দক্ষিণ ব্রাজিলের প্যারাগুয়ে, টাকুয়ারি ইত্যাদি নদীর অববাহিকা এদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল। সেখানকার ছোটখাটো ঝোরা , খাল-বিল-পুকুরে এদের স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাওয়া যায়। ওখানে যে বৃষ্টি অরন্য আছে সেখানে যখন বন্যা হয় ব্ল্যাক নিয়নরা তখন প্রজনন করতে ওই প্লাবিত বনে ঢুকে পড়ে, সেখানে ডিম-বাচ্চার পাঠ চুকিয়ে আবার শুষ্ক ঋতুতে নিজেদের পুরোনো বাসস্থানে ফিরে আসে। অরন্যের পাতাপচা কালচে বাদামী জলে একে অপরকে চেনার জন্য তখন তারা তাদের চকচকে 'নিয়ন' পার্শ্বরেখা ব্যবহার করে। কালচে বাদামী রঙের পরিবেশে তখন যেন ব্ল্যাক নিয়ন জ্বলজ্বল করে।

সঙ্গীসাথী :

যেহেতু এরা শান্তশিষ্ট ছোট মাছ তাই একই রকম শান্ত প্রকৃতির ছোটখাটো মাছই এদের আদর্শ ট্যাঙ্কমেট। সেই তালিকায় নিয়ন, কার্ডিনাল, রামিনোজ টেট্রা, লেমন টেট্রা, হকিস্টিক, বিভিন্ন ছোটখাটো রাসবোরা, ড্যানিও ইত্যাদিদের রাখা যায়। তবে খেয়াল রাখবেন খুব বড় বা আক্রমণাত্মক মাছ এদের সাথে না রাখাই ভালো, নচেৎ অচিরেই এই কালো মানিক তাদের খাদ্যে পরিণত হতে পারে।

ট্যাঙ্ক সেট-আপ :

প্রকৃতিতে এরা মৃদু আম্লিক জলের (পি এইচের মান ৬-৬.৫) বাসিন্দা হলেও অন্যান্য অনেক টেট্রাদের তুলনায় এদের বিভিন্ন রকমের জল সহ্য করে নেওয়ার ক্ষমতা বেশি (TDS ২৫০-৩০০ ppm পর্যন্ত)। একটা ৭০-৮০ লিটারের ট্যাঙ্কে ছোটখাটো ঝাঁক আরামে থাকতে পারে। সরু ডালপালা, জলজ গাছপালা, শুকনো পাতা , গাঢ় রঙের সুক্ষ্ম বালি দিয়ে ট্যাঙ্ক সাজিয়ে দিলে এদের দেখে কে! গাছপালা না থাকলে মাঝারি থেকে মৃদু আলোর আলো-আঁধারিতেও এদের খেলা জমে যেতে পারে। কিছু ভাসমান গাছপালা, অনেকটা ফাঁকা সাঁতার কাটার জায়গা পেলে এরা যে কোন ট্যাঙ্ককে এদের নিশ্চিন্তে বসবাসের উপযোগী বলে মনে করে। তবে আর যাই হোক এদের লাফানোর ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি, তাই ঢাকনা বাঞ্ছনীয়। জলে মৃদুমন্দ স্রোত, সপ্তাহ ২৫-৩০% জল পরিবর্তন এবং ভালো ফিল্ট্রেশন (Hang on Back– Internal Hanging filter জাতীয় কিছু) দিলে এদের আর কিছুই চাই না।

খাবার-দাবার :

সবকিছু সোনামুখ করে খায়, শুধু মুখে ধরা চাই। ছোটখাটো পোকামাকড়, কেঁচো, ব্লাড ওয়ার্ম, মশার লার্ভা, ডাফনিয়া , ফ্লেক্স, প্যালেট কিছুই বাদ দেয় না। যেহেতু এরা খেতে ভালোবাসে তাই দিনে দুবার খাওয়ানো সবচেয়ে ভালো। অভ্যাস করাতে পারলে হাতের থেকেও খেয়ে যায়, তবে নীচে পড়ে যাওয়া খাবার সহজে খেতে চায় না। তাই যদি খাবার পড়ে থাকার চান্স থাকে সেক্ষেত্রে ছোটখাটো কোরিডোরাস এদের সাথে রাখতেই পারেন, ওরা নীচে পড়ে যাওয়া খাবার খেয়ে ট্যাঙ্ক পরিস্কার করে দেবে।

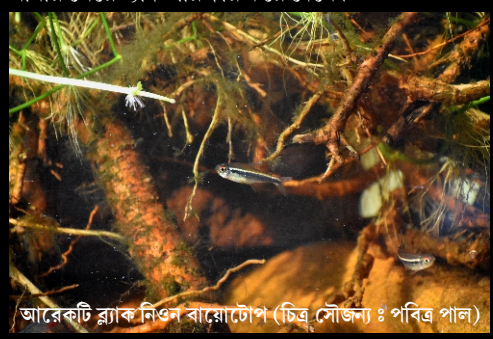
আরেকটি ব্ল্যাক নিওন বায়োটোপ (চিত্র সৌজন্য ঃ পবিত্র পাল)

ছেলে-মেয়ে চেনার উপায় :

ছেলে-মেয়ে সবাইকে একরকম দেখতে, ছোটবেলায় আলাদা করে চেনাই যায় না, বছর খানেক বয়স হলে এরা পরিনত হয়, তখন মেয়েরা আকারে সামান্য বড় এবং একটু গোলগাল হয়ে যায়, ছেলেগুলোর লম্বাটে গড়নের হয়। সাধারণত ঝাঁকে ব্রিডিং করে, এবং সাবস্ট্রেটর উপর মস, অ্যালগি, বা ঝড়া পাতার স্তরের উপর ডিম ছড়িয়ে দেয় । ছোট বাচ্চারা ৩-৪ দিন পর থেকে নিজেরাই স্বাবলম্বী হয়ে যায়; অ্যালগি, জলজ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকামাকড়, প্লাংটন ইত্যাদি খেয়ে বড় হতে থাকে।

বায়োটোপ স্টাইল ট্যাঙ্কে ব্ল্যাক নিওন (চিত্র সৌজন্য ঃ পবিত্র পাল)

যাঁরা এখনও টেট্রা পুষতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, ভাবছেন টেট্রা নরম মাছ, যদি একটু এদিক-ওদিক হলে মরে যায়, তাদের জন্য এরা কিন্তু একদম উপযুক্ত পছন্দের মাছ। মোটামুটি হার্ডি টেট্রা, একটু যত্ন নিলে সহজে মরে না, এবং যা সুন্দর দেখতে তাতে একঝাঁক এক ট্যাঙ্কে থাকলে সৌন্দর্যে পয়সা উসুল হয়ে যায়। চেষ্টা করে দেখবেন নাকি একবার? ইচ্ছের গোড়ায় সুড়সুড়ি দেওয়া পাইরেটস ডেনের কাজ, সেটাই করে গেলাম, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।

অভীক ঘোষ

জলের মাছে রূপোর টিপ

চিত্র সৌজন্য ঃ গুগুল

তখন আমি সাইকেল চালাই, CIT রোডের ধারে একটা পুরোনো মাছের দোকানে যাই, মুগ্ধ হয়ে মাছ দেখি, দোকানদার কাকু হার্ডি মাছ এলে বলে নিয়ে যেতে, আমিও নিই, কারন তখন 'হার্ডি' শব্দটা মাছ আমার পোষার একটা প্রাথমিক শর্ত। সে মাছ দোকানি কাকুর অনুপ্রেরণায় হোক আর যাই হোক,যে মাছটিকে আমার প্রথম দর্শনে একেবারেই ভালো লাগেনি, সাদা ফ্যাকাশে হয়ে থাকা সেই মাছটাকেই শুধুমাত্র 'হার্ডি' হবার কারণেই গোটা আষ্টেক কিনে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি চলে এলাম। চলে তো এলাম, রাখি কোথায়? রাখার জায়গা হলো আমার আমাজন সোর্ডের জঙ্গলে ভরা একটা ট্যাঙ্কে। সে সব এক দিন ছিল, সাবস্ট্রেটে বালি দিয়ে বাল্বের আলোয় দূর্দান্ত আমাজন সোর্ড করতাম, পাওয়ার ফিল্টার চালাতাম। তাই বলে মাছ পোষায় মুন্সিয়ানা এসে গিয়েছিল তা কিন্তু একেবারেই নয়, বরং টেট্রা পোষার প্রথম দিকে বেশ হোঁচট খেতাম, মাঝে মাঝে মাছ মরতো, সন্দেহাতীতভাবে নিয়ন আর কার্ডিনাল মারার আনাড়িপনা ঈর্ষনীয় ছিল, যাইহোক পরবর্তীকালে কিভাবে সেইসব বাধা কাটিয়ে উঠিয়ে কিভাবে প্রথম সেই ফ্যাকাশে মাছটাকে সফলভাবে পুষতে পারলাম তাই নিয়ে আজকের গল্প, আর গল্পের নায়ক 'সিলভার টিপ টেট্রা (*Hasemania nana* ব্রাজিলের আমাজন-ওরিনোকো অববাহিকার ছোট ছোট নদীতে বসবাস করা এই মাছটা কিন্তু ঝাঁকে থাকতে ভালোবাসে। ভালোবাসে খোলা জায়গায় সাঁতার কেটে বেড়াতে। আপনার ট্যাঙ্কের জল যদি একটু Soft হয়, পরিবেশ যদি একটু আলো-আঁধারি থাকে, আর ট্যাঙ্কের মাঝ বরাবর যদি বেশ কিছুটা খোলা জায়গা দেওয়া যায়, তবে উজ্জ্বল তামাটে রঙের এই মাছটা যখন ঝাঁকে বেঁধে ঘুরে বেড়াবে তখন কিন্তু আপনি মুগ্ধ হতে বাধ্য।

যে মাছ আমি কলের জলে রেখেছি, আবার ডিসকাসের সাথেও রেখেছি; GHM-ও খেয়েছে, কেঁচো, টেট্রা বিটস সবকিছুই খেয়েছে; শীতকালে হিটার ছাড়াই ভালোভাবে বেঁচে থেকেছে তাদের আর যাই হোক 'হার্ডি' না বলে পারা যায় না।

তবে মাছ বেঁচে থাকা এক কথা , বিহেভিয়ার লক্ষ করা আরেক। বিহেভিয়ার লক্ষ্য যদি করতে হয় তবে আমি বলবো এদের ঝাঁকে রাখুন, অন্ততঃ আটটার। কাঠ-ডালপালা, পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করে একটু হাইডিং স্পট তৈরি করে দিন, তারপর মজা দেখুন। দেখবেন মাছ যত বড় হচ্ছে তত রং খুলছে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মাছের শরীর তামাটে হয়, পাখনার শেষ প্রান্তে রুপালি 'টিপ' ফুটে ওঠে, মহিলারা কিন্তু সে তুলনায় কিছুটা ফ্যাকাশে, গোলগাল, পেটটা বড়। তবে এদের রূপের বর্ণনাই শেষ কথা নয়, আসল মজা এদের দুষ্টুমিতে। এরা কিন্তু অন্য মাছের লেজঝোলাঝুলিতে বিশ্বাসী, অর্থাৎ ফিন নিপার। পাখনা টানাটানির বদভ্যাস আছে। তবে এটা কিন্তু আমার একান্ত ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা, আপনাদেরও কি তাই?

ওহো, একটা তো বলতেই ভুলে গেছি, আচ্ছা এটা বলেই শেষ করি, ছোট হলে কি হবে এরা কিন্তু বেশ শিকারীও বটে। ধরুন আপনি এদের নিয়মিত কেঁচো খাওয়ান, কিছু কেঁচো সাবস্ট্রেটে আটকে থাকে, এরা যে সেগুলো লক্ষ করে না তা কিন্তু একদম নয়, ঠিক খেয়াল রাখে। সাবস্ট্রেট থেকে কেঁচো মাথা তুললেই আশেপাশে ঘোরাঘুরি শুরু করে। তারপর হঠাৎ করে ছোঁ মেরে আক্রমণ। ছোট্ট একটা শিকারীর দ্বারা অসাধারণ একটা শিকারের মূহুর্ত। কি দেখতে চান এরকম মূহুর্ত, তাহলে আর দেরি কেন, করে ফেলুন একঝাঁক সিলভার টিপ টেট্রা। ধন্যবাদ।

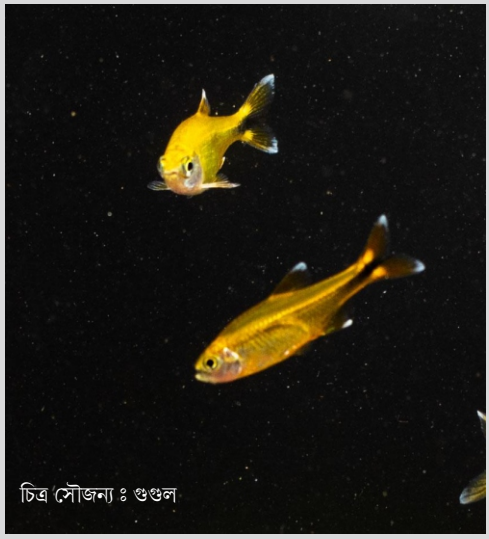

চিত্র সৌজন্য ঃ গুগুল

জ্যোতির্ময় রায়

মালাউই হ্রদের ডুবুরী

মালাউই হ্রদের নাম কে না শুনেছি, আফ্রিকার বিখ্যাত রিফট ভ্যালি হ্রদ, জলের পরিমাণ দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম হ্রদ। তবে এর বিশেষত্ব আকারে নয়, বরং বিবর্তনের দৃষ্টিতে এই হ্রদ যেন এক বিস্ময়। কারণ এই হ্রদের এক বিশেষ ধরনের মাছ 'সিকলিড'। মুখে ডিম-বাচ্চা রেখে বড় করা এই পরিবারের শতশত প্রজাতির মাছ এই হ্রদের জলের নিচে দ্রুত বিবর্তিত হচ্ছে। নতুন নতুন প্রজাতির আবিস্কার হচ্ছে। বিজ্ঞানী থেকে আম মেছো সবার কাছেই যেন এই হ্রদের রঙিন সিকলিডরা চরম বিস্ময়ের পরম কাঙ্ক্ষিত মাছ। আমিও এদের রঙের ছটা থেকে মোহমুক্ত হতে পারিনি। আর যাঁরা সেটা হতে দেয়নি তাঁরা Haplochromis, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে একটি বিশেষ প্রজাতির হ্যাপলোক্রোমিস, নাম *Fossorochromis rostratus*, বা মালাউই স্যান্ড ডাইভার। আজ ওদের নিয়েই কথা বলবো.....

চিত্র সৌজন্য ঃ পবিত্র পাল

প্রথম যখন রস্ট্রাটাস কিনি তখন সেটা বাচ্চা, গায়ে কোন রং নেই, রূপালী আঁশের দেহের উপর পার্শরেখা বরাবর পাঁচটি গোলাকার কালো কালো দাগ। ঠিক যেন গড়পড়তা তেলাপিয়া-তেলাপিয়া দেখতে। তবে একটা বিষয় লক্ষনীয়, সেটা হচ্ছে স্পিড আর ব্যাক্তিত্ব। যতই বয়সে ছোট হোক না কেন এদের স্যান্ড নিপিং বিহেভিয়ার কিন্তু ছোট থেকেই ছিল, অর্থাৎ মুখে কিছু বালি তুলে কিছুক্ষণ কুলকুচি করে ফেলে দেওয়া, ঠিক যেন একটা চলমান 'বালিপ্রপাত'। ফলাফল সাবস্ট্রেট জুড়ে এখানে-ওখানে বালির ঢিপি আর গর্ত। সাবস্ট্রেট যদি মোটা করে দেওয়া না হয় তবে কাঁচ বেড়িয়ে যাওয়া অবসম্ভাবী।

অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখতে হলে :

প্রথম চাহিদা বিশাল বড় অ্যাকোয়ারিয়াম। অন্ততঃ ৬-৮ ফুট লম্বা, কলোনি রাখতে হলে আরও বড় ট্যাঙ্ক। কারণ একে তো এরা সাঁতার কাটতে ভালোবাসে তার উপর বড় হলে প্রচন্ড অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়। ট্যাঙ্ক ছোট হলে সঙ্গী-সাথীদের ছালচামড়া ছাড়িয়ে নেবে।

দ্বিতীয়তঃ, চাই সুক্ষ্ম বালির পুরু স্তর। কারণ এরা শুধু বালি খুঁড়তে ভালোবাসে না, ভয় পেলে গ্যালেট পাখির মতো ডাইভ দিয়ে বালির নিচে ঢুকে পড়ে। তাই এরা স্যান্ড ড্রাইভার।

তৃতীয়তঃ, অত্যন্ত ভালো ফিল্ট্রেশন। সাম্প, ক্যানিস্তার বা ওভারহেড সাম্প এর বাইরে ভাবা উচিত নয়। প্রচন্ডভাবে পরিস্কার স্বচ্ছ জল পছন্দ করে, পরিস্কার স্বচ্ছ জলেই সবচেয়ে বেশি রং খোলে।

চতুর্থতঃ, মাংশাসী মাছ, প্রকৃতিতে ছোট মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে, তাই হাই প্রোটিন ফুড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রং আসার ক্ষেত্রে খাবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না, তাই কার্নিভোর প্যালেট, কেঁচো, ব্লাড ওয়ার্ম জাতীয় খাবার উচ্চভাবে সুপারিশযোগ্য।

আচার-আচরণ:

মাছটিকে শুধুমাত্র রঙের জন্য নয় বরং এর বিহেভিয়ার দেখার জন্যেও পোষা যায়, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো Sexual dimorphism, অর্থাৎ ছোটবেলায় সবমাছ রূপালী ধূসর থাকলেও বড় হওয়ার সাথে সাথে পুরুষ মাছেরা রং পরিবর্তন করে ঝলমলে ময়ূরপঙ্খী রঙের হয়ে যায়। এবং সেটা ঘটতে থাকে খুব দ্রুত। শুধু এই ট্রান্সফর্মেশনটা দেখার জন্যই এই মাছের প্রেমে পড়া যায়।

প্রেমের কথা যখন উঠলো তখন বলাই বাহুল্য প্রেমের ক্ষেত্রেও রস্ট্রাটাসরা পিছিয়ে নেই, পুরুষ মাছেদের জীবন রাজা-মহারাজাদের মতো রঙিন। তাঁর মূল কাজ, ঝলমলে উজ্জ্বল নীলাভ রং ধারণ করে মিটার খানেক ব্যাস যুক্ত একটা ব্রিডিং পিট খুঁড়ে ফেলা। এবং সেখানে বসে দুটি কাজ করা, এক আট-দশটি মহিলা রস্ট্রাটাসকে প্রেমেরজালে আকৃষ্ট করে ব্রিডিং চালিয়ে যাওয়া, এবং দুই অন্যান্য কোন মাছ বা নিজ প্রজাতির পুরুষ মাছ দেখলেই টেরিটোরি রক্ষার স্বার্থে মেরে ছাল-বাকল তুলে দেওয়া।

স্ত্রী মাছেরা সে তুলনায় অনেক বেশি শান্ত ও সংসারী। ব্রিডিং-এর পর ডিম মুখে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে তা দিতে বসে যায়, সাধারণত তিন সপ্তাহ পর মায়ের মুখের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়, এরপর মা ধীরে ধীরে বাচ্চাদের ছাড়তে থাকে, তবে বাচ্চারা ভয় পেলেই বা বিপদ বুঝলেই মায়ের মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঠিক যেন ক্যাঙারুর জলজ ভাই রস্ট্রাটাস। প্রকৃতিতে Fossorochromis এবং rostratus *Crytonocara moori* এর মধ্যে এক দারুণ মিথোজীবীতা লক্ষ্য করা যায়। Moori রা জীবন ধারণের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই *Fossorochromis rostratus* এর উপর নির্ভর করে। Rostratus এর বাসার আশেপাশে সাধারণত Moori রা ঘোরাফেরা করে, এবং সুযোগ বুঝে রস্ট্রাটাসের দলে ভিড়ে যায়। রস্ট্রাটাস যখন বালি খুঁড়ে খুঁড়ে খাবার সংগ্রহ করে, মুড়িরা সেই খাবারে সুকৌশলে ভাগ বসায়। সেই দিক দিয়ে দেখতে হলে মুরিরা রস্ট্রাটাসের খুব ভালো ট্যাঙ্কমেট। এছাড়াও যেহেতু এরা প্রায় ১০-১২ ইঞ্চি লম্বা হতে পারে তাই এদের সাথে বড় মালাউই হ্যাপ ছাড়া অন্য মাছ ট্যাঙ্কমেট হিসেবে রাখা উচিত নয়। মালাউই আইবিটার, ভেনাস্টাস সিকলিড, বোরলেয়ি, লিভিংস্টোনি, মালাউই হক জাতীয় মাছেরা এদের আদর্শ ট্যাঙ্কমেট।

পরিশেষে একথা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যেতেই পারে, মালাউই যারা ভালোবাসে রস্ট্রাটাসের আকর্ষণ তাদের পক্ষে উপেক্ষা করা কঠিন। আলো-আঁধারি পরিবেশ চকচকে উজ্জ্বল রস্ট্রাটাস সাঁতার কেটে চলেছে এ দৃশ্য দেখার জন্য একটা ড্রিম সেটআপ করাই যায়।

শুভদীপ দাস

For Advertisement Contact us at
9903569935 9333150179 9679747900

শ্রিম্প পাঁচালী

শ্রিম্পের পাঁচালী শুরু করার আগে চলুন, আমরা নাহয় একবার জাপান ঘুরে আসি। না,না, মানে সত্যি সত্যি ভিসা পাসপোর্টের কথা বলিনি! যেটা বলছি সেটা হলো জাপানের শ্রিম্প সম্পর্কিত একটা ছোট্ট লোককথার গল্প। সেই গল্পে আমরা দেখি এক বেশ বড়ো সাইজের পাখিকে যে নিজের বিশালাকৃতি নিয়ে বেশ গর্বিত। তা সেই পাখি একদিন উড়তে উড়তে নদীর ওপরে এসে বসে এক শ্রিম্পের শুঁড়ের ওপরে! সেই শ্রিম্প অবাক হয়ে যায় এটা দেখে যে তার শুঁড়ের ওপর বসা একটা পাখি নাকি তার নিজের আকার নিয়ে গর্ব করে বেড়ায়! এই শুনে তারও মনে হয় যে তাহলে আমিই বা পিছিয়ে থাকি কেন! আমিও যাই, আমি কতো বড়ো দেখিয়ে আসি সবাইকে। এই ভেবে সেও বেড়িয়ে পড়ে নিজেকে দেখাতে। তারপর একদিন ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে সে এক গুহার মুখে একটু বিশ্রাম নিতে বসে। কিন্তু কিম্বাশ্চর্যম! সে বসা মাত্রই গুহার মুখ যেন নড়ে ওঠে আর ভেসে আসে এক মাছের কণ্ঠস্বর, 'কে যেন আমার নাকের মধ্যে বসেছে এসে!' আর সাথে সাথে এক পেল্লায় হাঁচি! ব্যাস। সেই হাঁচির চোটে শ্রিম্প বাবাজি ছিটকে পড়ে শুধু না,তার সাথে সাথে তার সাইজও ছোট হয়ে হয়ে আজকের মতো ছোট্ট হয়ে যায়। অতি দেখনদারির যা ফল আর কি! তারপর থেকে আজ অবধি নাকি আমরা এই শ্রিম্পের ছোট রূপই দেখে আসছি যা এখন আমাদের অনেকের কাছেই কাঁচের বাক্সে বেশ প্রিয়।

আমাদের এই মেছো দুনিয়ায় ডোয়ার্ফ অর্নামেন্টাল শ্রিম্পরা প্রায় বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে বেশ জনপ্রিয়। এই মিষ্টিজলের ডোয়ার্ফ শ্রিম্পদের জগৎকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-সুলায়েসি (Sulawesi), নিওকার্ডিনিয়া (Neocardinia) আর কার্ডিনিয়া (Cardinia)। এর মধ্যে কার্ডিনিয়া বাবুলটি স্পিসিজের অন্য একটি রকমফের হলো গ্রীন বাবুলটি শ্রিম্প। এছাড়াও ইন্ডিয়ান জেব্রা শ্রিম্প, মালয় শ্রিম্প, রেনবো শ্রিম্প এই প্রজাতির মধ্যেই পড়ে। এবার এই "বাবুলটি" নামকরণের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। ১৯১৪ সাল, গোটা পৃথিবী তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঁচে সবে পুড়তে শুরু করেছে। আর সেই সময় এক ফরাসী প্রকৃতিপ্রেমিক, নাম গাই বাবুল্ট (Guy Babult) জলে জঙ্গলে খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন পাখী, মাছ, সরীসৃপের নমুনা। আর খুঁজতে খুঁজতে ভারতের এক জলাভূমি থেকে আবিষ্কার করলেন এক প্রজাতির শ্রিম্প! ব্যাস, সেই শ্রিম্প বিখ্যাত হয়ে যায় বাবুলটি শ্রিম্প নামে।

তারপর কেটে গেছে এক শতকেরও বেশী সময়। ভারতের জলাভূমি থেকে পাওয়া গেছে বিভিন্ন প্রকার

চিত্র সৌজন্য ঃ মৈনাক দে

চিত্র সৌজন্য ঃ গুগুল

শ্রিম্প যার মধ্যে প্রধান হলো নিওকার্ডিনিয়া ও কার্ডিনিয়া গোত্র। অ্যাকোয়ারিয়াম হবিস্টদের কাছে অন্যতম জনপ্রিয় যে শ্রিম্পটি, রেড চেরী শ্রিম্প, সেটিও এই নিওকার্ডিনিয়া গোত্রেরই অন্তর্গত। তাই আমরাও নজর দেব এই গোত্রের শ্রিম্পদের কাঁচের বাক্সে রাখার কিছু প্রাথমিক চাহিদাগুলোর দিকে।

এই নিওকার্ডিনিয়া শ্রিম্পদের একুয়ারিয়াম হবিতে জনপ্রিয় হওয়ার একটা কারণ যদি হয় এদের আকর্ষণীয় রঙ, তাহলে দ্বিতীয় কারণ অবশ্যই হবে এদের সহনশীলতা। মোটামুটি পিএইচ ৬.৫-৭.৫, জিএইচ ৪-৮, কেএইচ ৩-১৫, টিডিএস ১৫০-২০০ আর উষ্ণতা ২২-২৬ সেলসিয়াস এই জলের প্যারামিটার এদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধির জন্য যথার্থ হলেও এরা পিএইচ ৬.২-৮ এবং উষ্ণতা ১৪ থেকে ৩১ অবধি সহ্য করে নিতে পারে। তবে স্বাভাবিকভাবেই এতে তারা ভালো থাকবে না,জীবিত থাকবে,এটুকুই! বিশেষ করে জলের উষ্ণতা বেড়ে গেলে শ্রিম্পদের মেটাবলিসমের মাত্রা দ্রুত হারে বাড়তে শুরু করে যা ওদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক।

জলের এই স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটারের সাথে শ্রিম্পদের ভালো রাখতে গেলে আর কয়েকটা জিনিস একটু খেয়াল রাখা প্রয়োজন। যে কোনো ভালো শ্রিম্প ট্যাঙ্কের প্রাথমিক শর্ত হলো বেশ ঘন গাছপালার উপস্থিতি আর সাথে সাথে তাদের ফাঁকে অনেক লুকোনোর জায়গা, যেমন পাথরের খাঁজ, ছোট গর্ত, ঝোপেঝাড় ইত্যাদি। নিরাপদ বোধ করলে শ্রিম্পরা বেশ দলবেঁধে ওই সবুজ গাছপালার ওপর ঘুরে বেড়ায়। সে এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য! আর শুধু ঘুরে বেড়ানোই নয়, সাথে সাথে শ্যাওলা, বায়োফিল্ম ইত্যাদি খেয়ে সাবাড় করার ক্ষেত্রেও এদের জুড়ি মেলা ভার। তবে আপনি যদি "ওই তো, দিব্যি চড়ে খাচ্ছে, খাক" বলে পুরোটাই ছেড়ে দেন তাহলে কিন্তু চলবে না। কারণ ওদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করতে গেলে মাঝেমধ্যেই ক্যালসিয়ামে ভরপুর খাবার দিতে হবে। শ্রিম্পরা মাসখানেক অন্তরই খোলস ছাড়ে। তাই মাঝেমধ্যেই ট্যাঙ্কে সাদা সাদা খোলা পড়ে থাকতে দেখলে চমকাবেন না একদম। দেখতে না দেখতে ওরাই সেই খোলা খেয়ে সাবাড় করে দেবে। আর ট্যাঙ্কমেট? অটোসিনক্লাস ক্যাটফিশ আর স্নেল ছাড়া এদের ট্যাঙ্কে আর কাউকে রাখা যাবে না।

এবার এই পাঁচালীর শেষ পর্বে এসে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক শ্রিম্প ট্যাঙ্কের কিছু "নৈব নৈব চ" এর দিকে। শ্রিম্প ট্যাঙ্কের সবথেকে বড়ো শত্রু হলো জলের হঠাৎ হঠাৎ প্যারামিটারের ওঠাপড়া। জলে এমোনিয়া, নাইট্রেট, কপারের মতো মৌলের উপস্থিতি এদের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। তাই শ্রিম্প ট্যাঙ্কে শ্রিম্প ছাড়ার আগে কম করে এক মাস ট্যাঙ্ককে সাইকেল করতে দেওয়া দরকার। আর হঠাৎ হঠাৎ প্যারামিটার ওঠাপড়ার অন্যতম কারণ হলো অতিরিক্ত খেতে দেওয়া, মৃত শ্রিম্পের দেহ না সরানো ইত্যাদি। এগুলোর দিকে একটু নজর রাখা প্রয়োজন। আর হ্যাঁ, শ্রিম্প ট্যাঙ্কে আপনার ফিলটারের ইনলেট পাইপের দিয়ে মাঝেমধ্যেই একটু খেয়াল রাখবেন কিন্তু। জলের টানে পাইপে ঢুকে গিয়ে বেচারাদের প্রাণহানি হয়েছে এরম নজির কিন্তু কম নেই!

ব্যস, এবার আপনার ঘরে তৈরী করে ফেলুন একটা কাঁচের বাক্স, আর সেটা কিছুদিন সাইকেল করে গাছপালা লাগিয়ে ছেড়ে দিন এক ঝাঁক আপনার পছন্দের কোনো এক নিওকার্ডিনিয়া শ্রিম্প, আর ওই খুদেদের আশ্চর্য জীবনযাত্রার সঙ্গী হয়ে উঠুন আপনিও।

মৈনাক দে

"If there is magic on this planet, it's contained in water."

— Lorene Eisley

কাকজলার সেকাল – একাল

শেষবেলার আলো আঁধারি কাকজলার বুকে চিত্র সৌজন্য ঃ ইন্দ্রনীল মৈত্র

গল্পটা শুরু করা যাক একটা ছোট পরিচয় দিয়ে। নদীয়া জেলার এক ছোট্ট গ্রাম, নাম ধরলাম কাকজলা। ছোট, সুন্দর আর পরিষ্কার একটা গ্রাম। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবিকা বলতে চাষ- আবাদ, পশু পালন আর মাছ শিকার। খুব স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামের সিংহভাগ চাষ জমি, নদী ও খাল তীরবর্তী চারনভুমি।

সারা গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট বিল, জলা, পুকুর, বাওড়! এছাড়াও আছে বেশ কয়টি খাল আর তাদের প্রতিনিয়ত পুষ্টি জোগান দেওয়া হুগলি-ভাগীরথি নদীর অবিরাম প্রবাহ।

ধেনে চুনো চিত্র সৌজন্য ঃ অরবিন্দ পাল

প্রায় বছর ১৫ আগে থেকে জায়গা গুলোতে ঘুরে বেড়াই সুযোগ পেলেই। সেই ঘুরে বেড়ানোর সূত্রেই প্রথম পরিচয় হওয়া শুরু হয় দেশি মাছ, জলে গাছপালা, হরেক রকম পোকামাকড় , সরীসৃপ আর জলার পাখি। জলাভূমির প্রকারভেদে প্রাপ্ত প্রানীদের বিভিন্নতাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি লেখার সুবিধার্থে:-

পুকুর, বিল ও বাওড়- উক্ত এই তিন স্থলে এক সময় প্রচুর পরিমানে চোখে পড়ত হরেক রকম পুঁটি, শাল, শোল, গুতে, ট্যাংরা এর মত মাছ। পানকৌড়ি, ডাউক আর মাছরাঙার মত পাখি আসতো মাছ গুলোর লোভে। এছাড়া গেঁড়ি, গুগলি, ব্যাং, হরেক রকম সাপ ও গোসাপ দেখা যেত হামেশাই।

বর্তমানে যেটুকু চোখে পড়ল তাতে দেখলাম দেশি বলতে যা বাকি আছে তা হল এ দেশীয় টাকা। জলা জবর দখল করে যথেচ্ছ ভাবে চলছে মাগুর, কাতলা, রুই, রুপচাঁদা, তেলাপিয়া মাছের চাষ। হাতে গুনে কিছু কাক আর শালিক ছাড়া কোনো পাখি চোখে পড়ে না। হয়তো মরশুম নয় তাই কোনো সাপ বা ব্যাং দেখলাম না।

খাল ও ধান ক্ষেত- বরাবরই সবচেয়ে কাছে এদেরই পেয়েছি আর তাই মাছের নেশার দায় অনেকটাই এদের ওপর বর্তায়। দেঁড়ের ঝাক কিংবা তেচোখার জলের সাথে প্রথম পরিচয় এখানেই। খালের জলে খোলসে, তেচোখা, দেঁড়ে, বেলে, ল্যাঠা, শোল বর্ষার জলে এখনো দেখা যায়। একবার এক কাকা জাল ফেলে অনেক মাছের মধ্যে পেয়েছিল ট্যাপা, প্রথম দর্শন ও প্রাকৃতিক পরিবেশে শেষ দর্শন সেটাই ছিল। খালের পার্শবর্তী ধানের জমিতে কাঁকড়া, চিংড়ি, আপেল শামুক প্রচুর পেতাম, রাসায়নিক সারের প্রভাবে যা আজ শুধু শামুকে এসে ঠেকেছে। প্রশাসনের খাল সংস্কারের প্রতি উদাসীনতা খুব তাড়াতাড়ি সব শেষ করে দেবে।

নদী- গ্রামের প্রাণ, গ্রামবাসীদের অবসর কাটানোর প্রিয় জায়গা দুই নদীর মিলন স্থল। প্রচুর পরিমানে জলজ গাছ, যাদের নাম না জানায় আমি দোষী। ধেনো, তেচোখা, ফেলে, পুঁটি, বোয়াল, কুঁচে, কালবোশ, বাটা, চিংড়ি, কাঁকড়া আর কত কি। সময়ের সাথে এদের সংখ্যা চোখে পড়ার মত হলেও বর্তমান সংখ্যাও নেহাত সামান্য নয়। তবে নদীর বালি চুরি কিংবা প্রতিদিনের কাপড় মত বিষয় গুলোর জন্য বাস্তুতন্ত্র বিপুল ক্ষতিগ্রস্থ।

গুঁড়ি খলসে। চিত্র সৌজন্য ঃ পবিত্র পাল

সব শেষে একটা বিশেষ তথ্য, এখানে বাস করে One of the most majestic aquatic creature গাঙ্গেয় ডলফিন বা শুশুক। সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে আজও বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দেখা দিয়ে যায় এই অনিন্দ্য সুন্দর প্রাণী।

আমাদের চারপাশে এরম হাজার হাজার কাকজলা আছে যাদের ভাগ্যে ওই নদীটুকুর সৌভাগ্যও হয়তো জোটে না। ছোটোখাটো পুকুর বিল বাওড়ই ভরসা। আর এই জলাভূমিগুলোকেই কিন্তু আমাদের সুস্থ বাস্তুতন্ত্রের ফুসফুস বলা চলে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের লোভের শিকার হচ্ছে এই জায়গাগুলি। ইঁট-বালি-সিমেন্টের জঙ্গলে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট জলজ প্রাণগুলি। এভাবে আমাদের অজান্তে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকেই হারিয়ে ফেলছি না তো! প্রশ্নচিহ্নটা কিন্তু ক্রমশই বড়ো হচ্ছে।

ইন্দ্রনীল মৈত্র

ভিক্টোরিয়া ভালো নেই

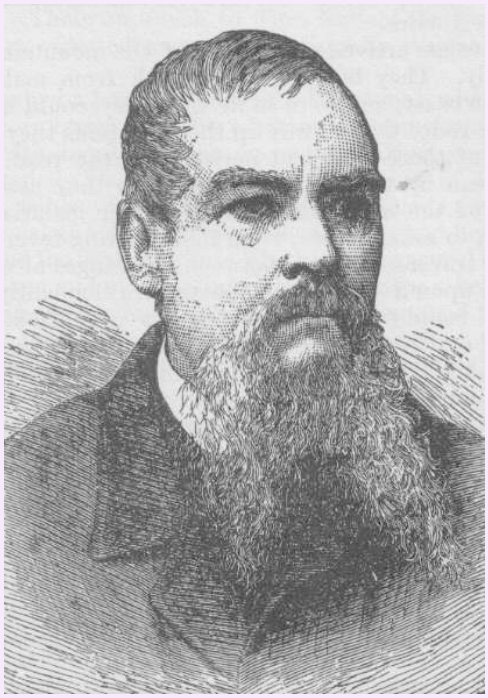

রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন

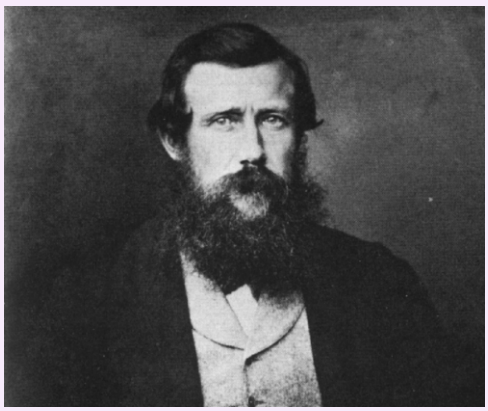

জন হ্যানিংস স্পেক

মানচিত্রে লেক ভিক্টোরিয়া

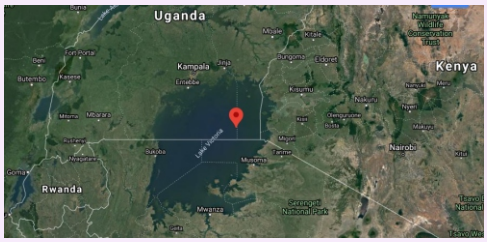

পাখির চোখে ভিক্টোরিয়া লেক

লেকের প্রাকৃতিক পাথুরে গঠন

ইউরোপীয়রা তখন পৃথিবী শাসন করছে, ব্রিটিশ রাজাদের রাজত্বের সূর্য অস্ত যাচ্ছে না, দিকে দিকে নতুন কলোনি গড়ে উঠেছে, কলোনির মধ্যেই নতুন নতুন জায়গা আবিস্কার হচ্ছে। নতুন নতুন খনিজ আবিস্কারের নেশা তখন পেয়ে বসেছে। তৃতীয় বিশ্ব থেকে শোষণ করা সেসব ধন-সম্পদে ব্রিটিশ অর্থনীতি ফুলেফেঁপে উঠেছে। নতুন নতুন ভুখণ্ডের খনিজ আহরণের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট দু হাতে পয়সা ওড়াচ্ছে, যাঁর পোশাকি নাম 'এক্সপিডিশন', প্রতিষ্ঠানিক ছাড়পত্র দিচ্ছে রয়্যাল ব্রিটিশ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি। লোক দেখানো উদ্দশ্যে নতুনকে জানা, আসল উদ্দেশ্য হয় নতুন কলোনি নয় নতুন খনি। উপরি হিসেবে পথে যা কিছু নতুন পাও রাজা-রানীর নাম দিয়ে দাও।

১৮৫৩ সাল Captain Richard Burton আরবীয় ছদ্মবেশে মক্কা সফর করে ফিরছেন। ইংল্যান্ডে তাঁর সাহসের গল্প মুখে মুখে ফিরছে। অন্যদিকে তরুণ ব্রিটিশ আর্মি অফিসার John Hanning Speke তখন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীতে, তাঁরা দুজনেই জানেন না পরের বছর থেকেই তাঁদের জীবন একসুত্রে বাঁধা হবে।পরের বছরই জন হ্যানিং স্পেক ক্যাপ্টেন রিচার্ড বার্টনের অভিযাত্রী দলে যোগ দিলেন, এবং পূর্ব আফ্রিকা অভিযানে অংশ নিলেন, কিন্তু সে অভিযান ব্যার্থ হলো এবং দুজনেই স্থানীয় আদিবাসীদের হামলায় জখম হলেন। স্পেক তো এমন আহত হলেন যে এখন-তখন অবস্থা। তবে শারীরিকভাবে ভেঙে পরলেও দুজনেই ছিলেন অসম সাহসী। মানসিকভাবে ভাঙলেন না। আবার অভিযানের তোড়জোড় হলো। এবার পয়সা দিলো রয়্যাল ব্রিটিশ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি। ১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাঞ্জিবার উপকূলের বিপরীত প্রান্ত থেকে আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের ভিতরের দিকে আবার যাত্রা শুরু হলো। উদ্দেশ্যে নীল নদের উৎস খুঁজে বের করা। আর স্থানীয় হেমিটিক জাতীয় আদিবাসীদের মুখ থেকে যে বড় বড় হ্রদের কথা শোনা যায় সেই জনশ্রুতি কতটা সত্যি যেটা যাচাই করে দেখা।

পথ চলতে চলতে দুজনে একদিন উপস্থিত হলেন এক বিশাল হ্রদের তীরে। আবিষ্কার করলেন টাঙ্গানিকা হ্রদ। তিনমাস সেখানে থেকে হ্রদের জরিপ করলেন কিন্তু বিধি বাম, আবার দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দুজনেই ফিরতি পথ ধরতে বাধ্য হলেন। কিন্তু জাঞ্জিবারের দিকে ফেরার আগেই তাঁরা শুনেছিলেন এই হ্রদ কিছুই নয় উত্তরে আরো এক বিশাল হ্রদ আছে। মনে মনে সেখানে যাবার পরিকল্পনা করতে করতে ফিরছিলেন এমন সময় স্পেক সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি তখন ছোট একটা দল নিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। উত্তরে গিয়ে স্পেক তো থ ! আদিবাসীদের কথাই ঠিক টলটলে নীল জলের বিশাল এক হ্রদ। ইংল্যান্ডের রানীর নামে সে হ্রদের নাম রাখলেন 'লেক ভিক্টোরিয়া'। সেই সাথে আবিষ্কার করলেন এই হ্রদই নীল নদের উৎস। কিন্তু ক্যাপ্টেন বার্টন তাঁর সহকারী জন হ্যানিং স্পেকের এই দাবি বিশ্বাস করলেন না, বার্টন মনে করতেন ট্যাঙ্গানিকাই নীল নদের উৎস। স্পেক আর দেরি করলেন না, দ্রুত ইংল্যান্ডে ফিরে আসলেন ক্যাপ্টেন রিচার্ড বার্টনের আগেই। এসেই এডিনবরা ম্যাগাজিনে নিজের অভিজ্ঞতা লিখে দিলেন। বললেন লেক ভিক্টোরিয়াই নীল নদের উৎস।

তারপর যা হয়, ক্যাপ্টেন বার্টন গেলেন বেজায় রেগে, তিনি স্পেকের দাবি যথারীতি মানলেন না, দুজনের মধ্যে শুরু হল মন কষাকষি, আকচাআকচি , তর্ক-বিতর্ক। তবে আমরা সে গল্পে ঢুকছি না। আমাদের গল্পের নায়ক লেক ভিক্টোরিয়া।

আফ্রিকার গ্রেট রিফ ভ্যালির সবচেয়ে বড় হ্রদ। পৃথিবীর দ্বিতীয় ও আফ্রিকার বৃহত্তম সুপেয় জলের হ্রদ। ২৬ হাজার স্কোয়ার মাইলের এই হ্রদের নাম শোনেনি বর্তমান দিনে এমন মৎসপ্রেমী সংখ্যায় বিরল। কারণ এই হ্রদের বাসিন্দা এন্ডেমিক সিকলিড, যা পৃথিবীর আর

কোথাও পাওয়া যায় না। হাজার হাজার বছরের বিবর্তনের ফলে এখানকার বর্তমান বাসিন্দা পাঁচশোর বেশি প্রজাতির রং-বেরংয়ের নেটিভ সিকলিড। কিন্তু বিগত সত্তর বছরের মানুষের অপরিনামদর্শী ক্রিয়াকলাপে সেই সৌন্দর্য আজ অতীত। হারিয়ে গেছে ২০০-এর বেশি প্রজাতি (বেসরকারি মতে সংখ্যাটা আরো অনেক অনেক বেশি, ৮০-৯০%) টিমটিম করে কোনমতে টিকে আছে হাতে গোনা কয়েকটি প্রজাতি। বিশুদ্ধতা হারিয়েছে বহু। খাদ্যাভ্যাস, বাসস্থান বদলে তারা হারিয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ভেঙ্গে পড়েছে সমগ্র হ্রদের বাস্তুতন্ত্র। এমন বহু ভিক্টোরিয়ান সিচলিড যা আজও অ্যাকোয়ারিয়ামে পোষা হয় তাদের আর কোন অস্তিত্বই নেই তাদের আদি বাসস্থানে। কিন্তু কেন এই ধ্বংসের জয়গান? সে ইতিহাস জানতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ঠিক একশো বছর আগে। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে।

হ্রদ আবিষ্কারের পরে কেটে গেছে সাত-সাতটা দশক, সালটা ১৯২০, আফ্রিকার ঐ অঞ্চল তখন উগান্ডা। উগান্ডা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দখলে। কলোনিয়াল প্রভুরা ভাবলেন এতো বড় মাপের হ্রদ পড়ে আছে মাছ চাষ করলে কেমন হয়? এতো বিশাল হ্রদে থাকে তো কিছু ছোটখাটো সিচলিড যাদের না আছে খাদ্যগুন না আছে মুনাফা; একেবারে বেকার মাছ বা Trash fish তাই সেহ Trash fish দের বড় মাছের খাদ্য বানিয়ে দেওয়া হোক আর ছাড়া হোক কিছু বড় মাছ যাদের অর্থনৈতিক মূল্যে প্রচুর। কিন্তু কি মাছ ছাড়া যায়? প্রস্তাব এলো তিলাপিয়া এবং নাইল পার্চ (*Lates niloticus*) ছাড়ার।

কিন্তু তখনকার বৈজ্ঞানিক-আধিকারিকদের একাংশের বিরোধিতার কারণে সে যাত্রায় নাইল পার্চ ছাড়া হলো না। ছাড়া হলো তিন ধরনের তিলাপিয়া মাছ। যথাক্রমে Red breasted tilapia (*Coptodon rendalli*), Red belly tilapia(*C.zillli*) ও নাইল তিলাপিয়া (*Orechoromis niloticus*)। ছাড়া পেয়েই এই তিনটি প্রজাতির মাছ হামলা শুরু করলো নেটিভ সিচলিডদের উপর। ভাগ বসালো খাবার ও বাসস্থানে। শুরু হলো নেটিভ মাছের বাচ্চা ধরে খাওয়া এবং নিজেদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি।

মুনাফার স্বাদ পাওয়া মানুষ এই ধ্বংসলীলা চোখের সামনে দেখেও যেন দেখলো না বরং শুরু হলো আরো মারাত্মক এক পরিকল্পনা। সালটা ১৯৫৪-৫৫, Uganda Game Fisheries Department (UGFD) ভিক্টোরিয়ার সংলগ্ন Kyoga হ্রদে ছেড়ে দিল ভয়ঙ্কর রাক্ষুসে মাছ নাইল পার্চ (যাদের দৈর্ঘ্য ছয় ফুট ও ওজন ২০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে)।

প্রথম দিকে এর প্রভাব সেভাবে চোখে না পড়লেও ধীরে ধীরে এর প্রভাব শুরু হলো। প্রথম পূর্ণবয়স্ক নাইল পার্চের দেখা পাওয়া গেল ১৯৭৯ সালে, কেনিয়ার Nyanza উপসাগরীয় অঞ্চলে। ২-৩ বছরের মধ্যে উগান্ডার জলভাগে এবং ৪-৫ বছরের মধ্যে তানজানিয়ার Mwanza উপসাগরীয় অঞ্চলে পূর্ণ বয়স্ক নাইল পার্চের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো, সালটা তখন ১৯৮৪-৮৫। পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৮৫-৮৬ নাগাদ ভিক্টোরিয়া হ্রদে প্রথম বার নাইল পার্চের বাচ্চা পাওয়া গেল। সেটাই হলো স্থানীয় জীবন বৈচিত্র ধ্বংসের চরম

প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক বাসস্থানে ভিক্টোরিয়ান সিকলিড

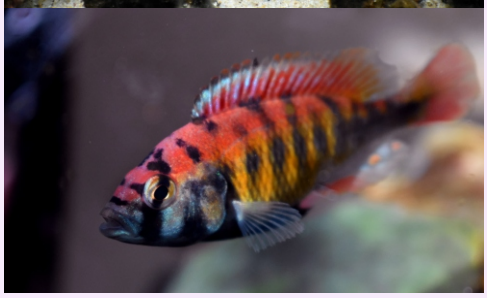

শখের অ্যাকোয়ারিয়ামে
ভিক্টোরিয়ান নাইরেরি সিকলিড চিত্র সৌজন্য ঃ পবিত্র পাল

সময়। পরবর্তী দশ বছরে একটি প্রজাতির মাছ পুরো হ্রদের জীব বৈচিত্র্য ৪০% বিলুপ্ত করে দিল। নাইল পার্চ ছাড়ার আগে ভিক্টোরিয়া হ্রদে মোটামুটি ভাবে সাত ধরনের সিকলিড বসবাস করতো। যথাক্রমে, Herbivore (শাকাহারি, মুলতঃ জলজ শ্যাওলা ভোজী), Detrivore (ময়লা খাদক), Zooplanktonvore (প্রাণীকণা খাদক), Insectivore(পতঙ্গভূক), Molluscivores (শামুক-ঝিনুক খাদক), Picivore (মাছখোর), এবং Pawn eaters (চিংড়িখোর)। কিন্তু নাইল পার্চের আগমনে Picivore, Pawn eaters, Detrivore এবং Molluscivores রা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। একদিকে নাইল পার্চ যেমন তাদের খাদ্য ভাগ বসালো তেমনি তাদেরকেও ধরে ধরে খেতে লাগলো। এই চার ধরনের মাছ খাদ্য সংগ্রহের জন্য পাথুরে এলাকায় না থেকে খোলা জলে থাকতো ফলে এদের ধরে খাওয়া নাইল পার্চের পক্ষে অনেক বেশি সহজ হলো। তুলনামূলক ভাবে Insectivore, Herbivore, Zooplanktonvore রা পাথরের খাঁজে লুকিয়ে থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পেল। কিন্তু এতে শেষ রক্ষা হলো না। এই মাছগুলি একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে যে বাস্তুতন্ত্র রচনা করেছিল তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় Detrivore রা সংখ্যায় অত্যন্ত কমে যাওয়ার জৈব পচনশীল পদার্থ হ্রদের জলের নীচেই পচতে থাকলো যা জলকে দ্রুত দুষিত করে তুললো এবং এর ফলেও বহু মাছ মরতে লাগলো। এভাবে একটা ধ্বংসের chain effect তৈরি হলো।

যাইহোক, নাইল পার্চের আগমনে মানুষের একটা সুবিধা হলো, নাইল পার্চের অর্থনৈতিক মূল্য প্রচুর। তাই আফ্রিকার মতো গরীব মহাদেশের স্থানীয় বাজারে সেই মহার্ঘ সেই মাছ বিকোলো না। বিকোলো ইউরোপ-আমেরিকার বাজারে; উচ্চমূল্যে। ফলে চটজলদি হাল ফিরতে লাগল ভিক্টোরিয়ার জেলেদের। তাই দেখে মানুষ দ্রুত ভীড় করতে লাগলো ভিক্টোরিয়া হ্রদের চারিপাশে। হ্রদের চারপাশে গড়ে উঠতে লাগল একের পর এক মৎস বন্দর, জমে উঠল মৎস প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও বিদেশে চালানের ব্যবসা। কাটা হতে লাগলো জঙ্গল গড়ে উঠতে লাগল জনবসতি ও খামার। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যেই জনসংখ্যা পৌঁছে গেল ৩০ মিলিয়নের কাছাকাছি। এবং তা প্রতি বছর গড়ে ৩% হারে বাড়তে থাকলো। এর ফলে শুরু হলো overfishing ফলে কমতে থাকলো নাইল পার্চের সংখ্যা। নব্বই এর দশকের শেষ দিকে একে বড় আকারের নাইল পার্চ বিরল হয়ে পড়লো। জেলেদের জালে পড়তে লাগলো মাঝারি ও ছোট আকারের নাইল পার্চ। আর্থিক তাড়নায় তাদেরকেই ধরা চললো পুরোদমে। ফলে একটা সুবিধা হলো নাইল পার্চের পপুলেশন দ্রুত কমতে হতে লাগলো।

এদিকে ততদিনে, নগরায়নের চাপে পিষে যেতে শুরু করেছে হ্রদের চারিপাশের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র। গাছপালা কেটে তৈরি হয়েছে বিশাল বিশাল খামার। ফলে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে ভুমিক্ষয়। চাষের কাজে ব্যবহৃত সার-বিষ বৃষ্টির জলের সাথে মিশে ধুয়ে পড়তে লাগলো হ্রদের জলে। সাথে যোগ হলো নগরায়নের কুফল মানুষের তৈরি বর্জ্য, প্লাস্টিক, থার্মোকল ইত্যাদি।

সবে মিলে যে সমস্যা গুলো দেখা দিল -

১ হ্রদের জল ঘোলা হয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ রুদ্ধ করলো, ফলে নেটিভ গাছপালা মরে যেতে লাগলো।

২ সিকলিডদের ব্রিডিং গ্রাউন্ড ক্ষতিগ্রস্থ হতে লাগলো, ফলে তাদের সংখ্যা আরো কমে যেতে থাকলো।

৩ ফসফেট জাতীয় বর্জ্য Algae bloom করে দিল। যাঁর সম্মিলিত সুযোগ নিল আরো একটি invasive introduced weed, কচুরিপানা। দ্রুত ভরে যেতে থাকলো ভিক্টোরিয়া হ্রদের চারিপাশ। ২০০১ এ পৌঁছে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হলো যখন ভিক্টোরিয়া হ্রদ যতদূর চোখ যায় যতদূর শুধুই কচুরিপানা। জল দেখা যায় না। এর কিছু সুফল ও কুফল দুই হলো -

প্রথমতঃ কচুরিপানার সৌজন্যে overfishing এ ভাঁটা পড়লো। ফলে কিছু কিছু প্রজাতি যাঁরা একেবারে বিলুপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁরা কচুরিপানাকে আশ্রয় করে মানুষ ও নাইল পার্চের আক্রমণ দুটোই প্রতিরোধ করে টিকে থাকলো।

দ্বিতীয়তঃ কচুরিপানা ব্যবহার করে হস্তশিল্প শুরু হলো। ফলে ঐ অঞ্চলে বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি হলো।

তৃতীয়ত, হ্রদের চারিপাশের দেশগুলো এতোদিন পর নড়েচড়ে বসলো। শুরু হলো ভিক্টোরিয়া বাঁচাও অভিযান। মানুষজনকে সচেতন করার কাজ শুরু হলো। Waste management প্রকল্প গৃহীত হলো এবং হ্রদের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দেশী-বিদেশি সরকারী-বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে এলো। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভিক্টোরিয়ায় বর্জ্যের আগমনে ভাঁটা পড়লো। ধীরে ধীরে কচুরিপানাও কমতে শুরু করলো। কিন্তু বহু বছরের অবহেলায় ভিক্টোরিয়ার মুখে যে বার্ধক্যের ক্লান্তির ছাপ পড়েছিল তা রয়েই গেল।

কচুরিপানার আগ্রাসন। এই কি ভিক্টোরিয়ার ভবিষ্যৎ?
চিত্র সৌজন্য ঃ গুগুল

দেখা গেল হ্রদের Zooplanktonvore ছাড়া বাকি প্রজাতির সিংহভাগ মাছই হয় বিলুপ্তির দরজায় কড়া নাড়ছে অথবা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে নাইল পার্চ সংখ্যায় কমে যাওয়ার পর কিছু প্রজাতির মাছ পুনরায় স্বল্প সংখ্যায় পাওয়া যেতে শুরু হয়েছে। তাদের মধ্যে ডল্লেখযোগ্য হলো *Haplochromis thereterion*। দেখা গেল এই মাছটি আগে Open water এ বসবাস করতো কিন্তু বর্তমানে নাইল পার্চের ভয়ে গভীর জল ছেড়ে হ্রদের কিনারে পাথুরে অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছে। খাদ্যাভ্যাস বদলে ফেলেছে। পতঙ্গভুক থেকে পতঙ্গের লার্ভাভুক হয়ে গেছে।

তেমনি বিভিন্ন মাছের বাঁচার তাগিদে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছে-

১] কিছু মাছ পাপাইরাসের, (জলজ ঘাস) কচুরিপানার জঙ্গলে ঢুকে থেকে নিজেদের কোন রকমে রক্ষা করেছে।

২] কেউ ঘোলা জলে থাকতে বাধ্য হয়েছে বলে অক্সিজেনের অভাবে তাদের ফুলকার আকার বড় হয়ে গেছে।

৩] ঘোলা জলে ভালো দেখার প্রয়োজনে কারোর চোখের আকৃতি আগের তুলনায় বড় হয়েছে।

৪] দ্রুত সাঁতার কেটে পালাবার জন্য কোন কোন মাছের লেজ ও বক্ষ পাখনা আকারে বড় হয়েছে। মাথার আকৃতি সরু ও ছোট হয়েছে। ইত্যাদি।

পরিশেষে এখন প্রশ্ন ওঠে তাহলে যাঁরা হারিয়ে গেল তাঁরা কি একেবারেই গেল? উত্তরটা কিছুটা হলেও আশাব্যঞ্জক। যেহেতু ভিক্টোরিয়ান সিচলিডরা রঙিন মাছের জগতে বেশ প্রসিদ্ধ ছিল, তাই কিছু প্রজাতির মাছ এখনো captive breeding এর মাধ্যমে টিকে আছে। যাঁদের আমারা বিভিন্ন অ্যাকোয়ারিয়ামে দেখা পাই। কিন্তু এদের Wild population ধ্বংস হয়ে গেছে মানুষের ইতিহাসের এক চরম স্বার্থপরতার কারণে। যতদিন পৃথিবীর যেখানে যেখানে নিজেদের স্বার্থে মানুষ এভাবে ছেড়ে চলবে introduced species দের ততদিন এরকম অনেক 'ভিক্টোরিয়ারা' খারাপ থেকে আরো খারাপ থেকেই যাবে।

তথ্যসূত্র:

www.wikipedia.org
www.historytoday.com
www.icungisd.org
www.nationalgeographic.org
www.columbia.edu

পবিত্র পাল